ভালোবাসার মুখ

- মনি অধিকারী

ঠিক তিনটায় হোটেল থেকে বের হলাম। সাতটায় আমার ট্রেন। *জগন্নাথপুর এক্সপ্রেস*। ছাড়বে হাওড়া থেকে। সোয়া পাচটায় হাওড়া স্টেশনে পৌছে গেছি। জগন্নাথপুর এক্সপ্রেস কোন লাইনে জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পারলাম ওই ট্রেন পাচটায় ছেড়ে গেছে। টিকেট বের করে দেখি ট্রেনের সময় পাচটা। আমি কেন যেন ভেবেছিলাম সময় সাতটা।

তিন দিন আগে লম্বা লাইনে দাড়িয়ে টিকেট নিয়েছি, সব বৃথা গেল।

একজন পরামর্শ দিল, এখনই টিকেট কাউন্টারে জমা দিলে অর্ধেক ভাড়া ফেরত পাওয়া যাবে।

টিকেট ফেরত দিয়ে বের হচ্ছি আর ভাবছি এখন কি করবো! ফের টিকেট পেতে তো আবার তিন দিন। তবুও চেষ্টা করে দেখি।

লাইনে দাড়াতেই এক ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন।

আপনি পুরী যাবেন?

আমি হ্যা বলতেই তিনি বললেন, আপনাকে আজ রাত নয়টায় *পুরী এক্সপ্রেস*–এর একটা টিকেট দিতে পারি। কোনো বাড়তি টাকা দিতে হবে না। এখন প্রায় সাতটা। চারজনের জন্য চারটা টিকেট নেয়া ছিল। কিন্তু একজন যেতে পারছেন না বিধায় একটা টিকেট বিক্রি অথবা ফেরত দিতে হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।

তিনি আমাকে টিকেটটা দিয়ে বললেন, গাড়ি প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে আছে, আসুন আমরা গাড়িতে উঠে পড়ি। পরে টাকা দেবেন। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

আমি এগোতেই তিনি পাশে দাড়িয়ে থাকা একটা মেয়েকে ডাকলেন, মাধুরী এসো। মাসিমা আসেন, আমরা ট্রেনে উঠে পড়ি।

প্ল্যাটফর্মে এসে রিজার্ভেশন চার্টে নাম দেখে নির্দিষ্ট বগিতে উঠলাম।

সিট নাম্বার দেখে বসতে বসতেই ভদ্রমহিলা এবার বয়স্কা মহিলাকে বললেন, মাসিমা, প্রবীরের জন্য যে টিকেটটা নেয়া হয়েছিল সেটা এ ভদ্রলোক নিয়েছেন। এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, উনি মাসিমা, আর এ মাধুরী, আমার ননদ। সঙ্গে আমার দেবরের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনো কারণবশত তার যাওয়া হলো না। তার টিকেটটাই আপনাকে দিলাম।

আমি মাসিমাকে নমস্কার করলাম।

তিনি আমাকে আশির্বাদ করলেন, বেচে থাকো বাবা। তোমাকে পেয়ে সাহস বাড়লো। আমরা তিন মহিলা ভয়ে ছিলাম।

সান্ত্বনা দিলাম, কোনো চিন্তা করবেন না। যা দরকার আমাকে বলবেন। টিকেটের টাকাটা মহিলাকে দিলাম।

যুবতী মেয়েটার কপালে সিদুর দেখে বুঝতে পারলাম সে বিবাহিত। বয়স চব্বিশ পচিশ বছর। দেখতে বেশ সুন্দর। তবে বেশি চুপচাপ।

ঠিক নয়টায় গাড়ি ছাড়লো। তারা তিনজন একদিকে বসে যাচ্ছে আর আমি একা একদিকে। বৌদির সঙ্গে মাধুরী আস্তে আস্তে কথা বলছে। মাসিমা ঝিমুচ্ছেন।

একটা বই বের করে পড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আলো এতো কম যে, পড়তে পারলাম না।

বৌদি টিফিন ক্যারিয়ার থেকে খাবার বের করে সাজাতে লাগলেন। আমার জন্যেও এক ভাগ হলো।

আপত্তি করলাম।

আপত্তি টিকলো না। এদের সঙ্গেই খাওয়া–দাওয়া শেষ করলাম। এগারোটা বাজতেই মাধুরী এবং বৌদি শুয়ে পড়লেন।

চলন্ত গাড়িতে ঘুমাতে পারিনা। বসে আছি। এক সময় মাসিমাও আমার পাশে এসে বসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথা থেকে এসেছি এবং পুরী কেন যাচ্ছি।

আমার নাম মনি। বাংলাদেশ থেকে এসেছি। নিতান্ত বেড়াতেই বের হয়েছি। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। প্রায় প্রতি বছরই একবার ইনডিয়ার বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যাই।

মাসিমা বললেন, তারা এসেছেন শেওড়াফুলি থেকে। মাধুরীর মা নিরুপমা দেবী তার আপন বোন না হলেও আপন থেকে অনেক বেশি আপন। মাধুরীরা দুই ভাইবোন। দাদা কমলেশ দীর্ঘ দিন যাবৎ অসুস্থ। বৌদি জয়ন্তী একটি স্কুলে শিক্ষকতা করে। তাদের বিয়ে হয়েছে পাচ বছর কিন্তু কোনো সন্তান নেই। মাধুরীর বিয়ে হয়েছে তিন বছর। তবে স্বামী, শ্বশুর বাড়ির লোকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। জামাই অশোক চাকরি করে রেলওয়েতে। এখন আছে পুরী। এ জন্যই তারা পুরী যাচ্ছেন। তার অবশ্য প্রধান উদ্দেশ্য পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পূজা দেয়া। পুরীতে তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন নেই।

হোটেলে উঠবো শুনে তিনি বললেন, আমি যেন তাদের সঙ্গে একই হোটেলে উঠি।

আমার কোনো আপত্তি নেই।

কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেল। মাসিমা শুয়ে পড়লেন। আমিও শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার ঘুম হলো না। মাধুরীও ঘুমায়নি। এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম কেন তার এতো মন খারাপ এবং এতো চুপচাপ। বৌদি ঘুমিয়ে গেছেন।

ছয়টা বাজতেই উঠে পড়েছি। মাসিমা, মাধুরীও উঠে পড়েছেন। কিন্তু বৌদি এখনো ঘুমিয়ে। বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড কুয়াশা। ফেব্রুয়ারি মাস, যথেষ্ট শীত। গাড়ি আটটার মধ্যে পুরী পৌছে যাবে।

হাত মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি।

বৌদি উঠে বিছানাপত্র গোছাতে গোছাতে গাড়ি পুরী স্টেশনে এসে গেল।

আমার সঙ্গে মাত্র একটি ব্যাগ। আমি আগেই নামলাম। এরপর মাধুরী, বৌদি তাদের ব্যাগ সুটকেস নিয়ে নামলেন।

মাসিমাকে আমিই ধরে নামালাম।

মাসিমা বললেন, বৌমা, মনি হোটেলে উঠবে, আর আমাদেরও তো হোটেলে উঠতে হবে। চলো আমরা মনির সঙ্গে একই হোটেলে উঠি।

বৌদির কোনো আপত্তি নেই।

স্টেশনে নেমে কোনদিকে যাবো ভেবে পাচ্ছি না। একজন টিটিকে পেয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন, ওই হোটেলে ওঠেন। স্টেশনের বাইরে ওদের গাড়ি আছে।

আমরা স্টেশনের বাইরে এসে ওদের গাড়ি পেয়ে গেলাম। হোটেলটা ভালোই। তিন তলায় দুটি রুম নেয়া হলো। একটায় আমি একা, অন্যটায় তারা তিনজন।

চা নাশতা খেয়ে ঘুমিয়ে গেছি।

বেলা দুটায় বৌদি এসে ডেকে তুললেন। কাপড়–চোপড় পরে ডাইনিং টেবিলে আসেন, কথা আছে।

তৈরি হয়েই নিচে নামলাম। খাওয়া শেষ হতেই মাসিমা বললেন, বাবা, তোমাকে বৌমার সঙ্গে এখন স্টেশনে যেতে হবে। মাধুরীর স্বামী, আমাদের জামাই ওখানে চাকরি করে। তুমি ছাড়া এখানে আর আমাদের কে আছে!

বৌদিকে নিয়ে স্টেশনে গেলাম। রিসেপশনে খোজ করতে জানা গেল অশোক চক্রবর্তী নামে একজন আছেন হিসাব বিভাগে। এখান থেকে একটু দূরে।

হিসাব বিভাগে যখন পৌছালাম তখন চারটা বেজে গেছে। অশোকবাবুর খোজ করতে জানা গেল তিনি বের হয়ে গেছেন। আজকে আর পাওয়া যাবে না।

ওখান থেকে বের হতেই বৌদি বললেন, এখন হোটেলে নয়, চলেন সি-বিচে যাই।

সি-বিচে রাত আটটা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করলাম। এখানে বসেই বৌদির সংসারের অনেক খবর জানলাম।

প্রথমেই তিনি বললেন, বৌদি নয়, আমার নাম জয়ন্তী। এ নামেই আমাকে ডাকবেন।

বললাম, তাহলে আমাকেও আপনি মনি বলে ডাকবেন।

ঠিক হলো, এখন থেকে আমরা একজন আরেকজনের নাম ধরেই ডাকবো।

জয়ন্তীর বিয়ে হয়েছে পাচ বছর। যখন বিয়ে হয় তখন কমলেশ, মাধুরীর দাদা ব্যাংকে চাকরি করতো। এখন সে বেকার এবং অসুস্থ। মাধুরীর বিয়ে হয়েছে তিন বছর। কিন্তু শাশুড়ি, ননদের অত্যাচারে সে এক বছরও স্বামীর ঘর করতে পারেনি।

দুই বছর হতে চললো মাধুরীর খোজখবর নেয় না অশোক। কারণ হলো যৌতুক। বিয়ের সময় মাধুরীর মা নাকি জামাইকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুক দিতে চেয়েছিলেন। এখন এ টাকা না পাওয়া পর্যন্ত তারা মাধুরীকে নেবে না। টাকার জন্যে শাশুড়ি, ননদরা তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে কষ্ট দিয়েছে।

অশোক বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। তারও ইচ্ছা মাধুরীর মা টাকাটা দিয়ে দিক। এদিকে মাধুরীদের সংসারও সচ্ছল নয়। তার একমাত্র দাদা বেকার এবং অসুস্থ। বাবা মারা গেছেন অনেক দিন। তাদের সংসারই চলে অন্যের কৃপায়।

আমরা নটায় হোটেলে ফিরে এলাম। মাধুরী, মাসিমা অধীর আগ্রহে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। অশোকের কি খবর এনেছি জানতে মাধুরী চুপচাপ বাইরে গিয়ে দাড়িয়ে থাকলেন।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, মন খারাপ করবেন না, আমরা কালকে আবার যাবো।

পরের দিন মাধুরী আর মাসিমাকে মন্দিরে নামিয়ে দিয়ে আমরা অশোকের অফিসে গেলাম। বিশেষ খোজাখুজি করতে হলো না। তারই একজন সহকর্মীই অশোকবাবুকে দেখিয়ে দিলেন। তাছাড়া জয়ন্তী তো আগে তাকে দেখেছে।

টেবিলের সামনে জয়ন্তীকে দেখতে পেয়ে অশোকবাবু যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। তবু একটা কথাই তার মুখ বের হলো, আপনি।

হ্যা, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। তুমি তো দেখলে না। চলো, বাইরে যাই, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়ন্তীর পিছু পিছু সে বের হয়ে এলো।

আমরা কাছেই একটা হোটেলে বসলাম।

আমাকে দেখে অশোকবাবুর প্রশ্ন, এ ভদ্রলোক কে?

জয়ন্তী এক কথায় উত্তর দিল, আমাদের বন্ধু। এর সঙ্গেই আমরা এখানে এসেছি। সঙ্গে মাধুরী এবং মাসিমা আছেন। এখন তুমি আমাদের সঙ্গে হোটেলে যাবে। মাধুরী তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

অশোক সব কথাই শুনলো। চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। তাকে একজন মেরুদণ্ডহীন প্রাণী বলেই মনে হচ্ছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, মাফ করবেন বৌদি, আজ যেতে পারছি না, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে। কাল পাচটার মধ্যে অবশ্যই আপনাদের হোটেলে আসবো।

আমরা তাকে হোটেলের ঠিকানা, রুম নাম্বার সবই দিলাম।

হোটেলে ফিরে ওদেরকে অশোকের খবর জানানো হলো। বিকেলে কেউ বের হলো না। একাকী এখানে-ওখানে ঘুরলাম।

পরের দিন জয়ন্তীকে নিয়ে ভুবনেশ্বর ঘুরে এলাম।

বের হওয়ার আগেই মাধুরী বার বার জয়ন্তীকে অনুরোধ করলো, আমরা যেন অবশ্যই চারটার মধ্যে ফিরে আসি।

ভুবনেশ্বর বাসে মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর। স্টেশনের কাছেই অনেকগুলো মন্দির। কিছু কিছু দেখলাম। মন্দিরে যেতে জয়ন্তী মোটেও আগ্রহী নয়।

আমরা ঠিক সময়েই ফিরে এসেছি। সবাই মিলে হোটেলে অশোকের জন্য অপেক্ষা করে আছি। আমি বার বার উপর–নিচ করছি। রিসেপশনেও বলে রেখেছি। কিন্তু হায়! পাচটা, ছয়টা, সাতটা, দশটা বেজে গেল। অশোক এলো না।

মাধুরী শুয়ে শুয়ে চোখের পানি ফেলছেন।

মাসিমা বার বার কপাল চাপড়াচ্ছেন আর বোন নিরুপমাকে দোষারোপ করছেন। কি দেখে এমন সুন্দর মেয়েটাকে জলে ফেলে দিল। জয়ন্তীর মুখেও কোনো কথা নেই।

পরের দিন নাশতার টেবিলে জয়ন্তী বললেন, মনিদা, চলেন আমরা অশোকের অফিস থেকে একটু ঘুরে আসি। সে কেন এলো না জানা দরকার।

আমরা অশোকের অফিসে পৌছাতেই তার এক সহকর্মী বললেন, অশোক তো পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছে।

বুঝতে পারলাম অশোক পালিয়ে বেচেছে। সে মাধুরীর মুখোমুখি হতে চায় না।

হোটেলে ফিরে অশোকের পালিয়ে যাওয়ার খবর বলতেই মাধুরী ডুকরে কেদে উঠে দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগলো।

মাসিমা বললেন, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাই না। মনি, তুমি ব্যবস্থা করো, আজ রাতের গাড়িতেই যেন ফিরে যেতে পারি।

কিন্তু যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়! ট্রেনের রিজার্ভেশন পেলাম তিন দিন পর। এ তিন দিন কিভাবে কাটবে! দুই দিন আমি আর জয়ন্তী ঘুরে এলাম কোনারক এফ কটক।

একদিন সবাই মিলে গেলাম চিল্কা। মাধুরী কিছুতেই যাবেন না। অনেক সাধ্য সাধনা করে তাকে নেয়া হলো। চিল্কা লেক দেখে সবাই খুশি।

পুরী থেকে রাত নটার ট্রেনে চেপে পরের দিন আটটায় হাওড়ায় পৌছালাম। ওরা শেওড়াকুলি গেল আর আমি আমার হোটেলে ফিরে এলাম।

বিদায়ের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মাসিমা এবং জয়ন্তী পীড়াপীড়ি করছিলেন তাদের সঙ্গে শেওড়াফুলি যাওয়ার জন্য। জয়ন্তীর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বললাম, কাল অথবা পরশু আমি আসছি।

জয়ন্তী বললেন, বিদেশি বন্ধু, কথা যেন ঠিক থাকে।

পরের দিন নয়, তার পরের দিন শেওড়াফুলি গেলাম। ওই দিন ছিল শনিবার। গ্রাম্য পরিবেশে কাচা–পাকা একটা বাড়ি। কিছু গাছপালা আছে। দরজার কড়া নাড়তে মাধুরী দরজা খুলে দিলেন। আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন।

মা দেখে যাও, কে এসেছেন।

মাধুরীর মা এলেন।

আমি পায় হাত দিয়ে তাকে প্রণাম করলাম।

তিনি আশীর্বাদ করলেন, বেচে থাকো বাবা। মাধুরী, বৌমা এ দুদিন শুধু তোমার কথাই বলছে।

তিনি আরো কতো কথা বলছেন। কিন্তু আমার কানে ঢুকছে না। শুধু তাকেই দেখছি। এ মহিলাকে আগে কোথায় দেখেছি, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

জয়ন্তীকে দেখছি না কেন?

মাধুরী বললেন, বৌদি স্কুলে গেছে, ফিরবেন দুইটার পর।

এক সময় বললাম, মামিমা আপনারা এখানে কতোদিন আছেন? আপনারা কি শেওড়াফুলির আদি বাসিন্দা?

না বাবা, আমরা এখানে এসেছি ১৯৬৫ সালে। আমরা তো ফরিদপুর জেলার ওই গ্রামের বাসিন্দা। এখন তো ফরিদপুর বাংলাদেশ। তখনকার রায়বাড়িকে না চেনে।

এতোক্ষণে আমিও চিনতে পারলাম। তিনি আদিত্য রায়ের স্ত্রী। আদিত্য রায় আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, আপনি তো আমার কাকিমা, মাসিমা নন।

তিনিও আমায় চিনতে পারলেন। আমরা যখন দেশ ছেড়ে আসি তখন তোমার বয়স ছিল সাত আট বছর। তোমার আর আমার কমলেশের তো একই বয়স। মাধুরীর বয়স তখন মাত্র দুই বছর। ১৯৬৫ সাল আর ১৯৮৫ সাল। এর মধ্যে বিশ বছর চলে গেছে।

কমলেশ কই, সে নাকি অসুস্থ?

মাধুরী বললেন, দাদাকে দেখবেন? আসেন বলে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন।

ঘরে একটি মাত্র খাট আর মেঝেতে বিছানায় দেয়ালে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে একটা লোক। পা দুটো চাদর দিয়ে ঢাকা।

এই তো কমলেশ, কতো সুন্দর হয়েছে। কমলেশের পাশে বসলাম।

আমায় চিনতে পারছো কমলেশ? আমি মনি। আজ থেকে বিশ বছর আগে আমরা একই স্কুলে পড়তাম। তোমাদের পাশের গ্রামেই আমাদের বাড়ি। তোমার বাবা আর আমার বাবা ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

কমলেশ একটু ম্লান হাসলো। হ্যা, চিনতে পারছি। অনেক দিনের কথা তো। তা তুমি এখন কোথায় আছো? কি করছো?

কোথায় কি করছি, তাকে সব বললাম। তা তুমি নাকি অসুস্থ। কি হয়েছে তোমার।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে কমলেশ বললো, আজ তিন বছর ঘরে পড়ে আছি। আমার পায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরাও দেখবে আমি কেমন আছি।

চাদরটা সরাতেই দেখি কোমর থেকে তার পা দুটি এমনভাবে শুকিয়ে গেছে মনে হচ্ছে পা নয়, দুটি শুকনো হাড় পড়ে আছে। তিন বছর আগে বাস থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যায় আর তখনি অন্য একটি বাস তার দুই পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। অনেক রকম চিকিৎসা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। পা দুটি শুধু শুকিয়েই যায়নি, সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে গেছে। সামান্য নড়াচড়াও করতে পারে না। কমলেশকে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

দুইটার পর জয়ন্তী ফিরলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তার যেন আনন্দের সীমা নেই। খুব কাছে এসে প্রায় কানে কানে বললেন, বিদেশি বন্ধু, তাহলে সত্যিই এলেন। আমি তো ভাবছিলাম আপনি আসবেন না।

আপনার বিশ্বাসকে মিথ্যা করে দিয়ে এসেই পড়লাম। জয়ন্তীকে বললাম, আপনার পতিদেবতা তো আমার পুরনো বন্ধু।

বিদায়ের আগে কমলেশের কাছে আবার গেলাম। কোনো কথা সে বললো না, শুধু দুই চোখ ভরে আমায় দেখলো।

জয়ন্তী বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন কাল কয়টায় ফ্লাইট।

বললাম, তিনটার মধ্যে আমাকে এয়ারপোর্টে পৌছাতে হবে।

জয়ন্তী জানালেন, দশটার মধ্যে তিনি আমার হোটেলে আসবেন। এর আগে যেন আমি বের না হই।

পরের দিন দশটার আগেই জয়ন্তী এলেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে দুইটায় হোটেল থেকে বের হলাম। পথে বিশেষ কোনো কথা হলো না।

একবার শুধু বললেন, আমার সংসার তো দেখলেন, কেমন লাগলো? এখন বুঝতে পারছেন তো কিভাবে বেচে আছি। বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, আবার কবে আসবেন?

আমি তো প্রায় প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসের মধ্যে একবার আসি। সব যদি ঠিক ঠাক থাকে তাহলে আগামী বছর ঠিক এ সময়ে আসবো। এবার যাবার ইচ্ছা মাদ্রাজ।

জয়ন্তী সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, আমি আছি। আমাকে না নিয়ে যেতে পারবেন না।

আমি তো অবাক! আপনি আমার সঙ্গে এতো দূর পথ যাবেন?

কেন নয়? এ রকম জীবনই তো চেয়েছি। আমার কোনো পিছুটান নেই।

এয়ারপোর্টে নেমে বিদায় নিলাম। আমার হাতে হাত রেখে বললেন, বিদায় বন্ধু। আশা করি এক বছর পর আবার দেখা হবে। বলে উল্টো দিকে হাটতে শুরু করলেন।

আমিও ভেতরে ঢুকে গেলাম।

পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় গেলাম। দুদিন পরেই শেওড়াফুলি এসেছি।

আমাকে দেখে সবাই খুশি। কমলেশের কোনো পরিবর্তন নেই। একই অবস্থা চলছে। আমি এবার মাদ্রাজ যাচ্ছি বলতেই কাকিমা বললেন, তুমি বাবা যাবার অথবা ফেরার পথে পুরী নেমে অশোকের খবর আনতে পারবে? সে এখনো ওখানেই আছে।

আমি কিছু বলার আগেই জয়ন্তী বললেন, মা, আমি মনিদার সঙ্গে যেতে চাই। মাদ্রাজের ট্রেন তো পুরী হয়ে যায়। আমি ওখানে নেমে অশোককে নিয়ে ফিরবো। আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই।

সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসছি, জয়ন্তী আমার সঙ্গে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এলেন। আমাকে জানিয়ে দিলেন কাল আমি আসছি আর এক সঙ্গে টিকেট নেয়া হবে।

পরের দিন আমরা মাদ্রাজের দুটা টিকেট নিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি পুরী যাবেন, তো মাদ্রাজের টিকেট নিলেন কেন?

সে দেখা যাবে। বলে তিনি চুপ করে গেলেন।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা মাদ্রাজ রওনা হলাম এবং একটানা সাতাশ ঘণ্টা ট্রেন জার্নি করে মাদ্রাজ পৌছালাম। এখানে আমরা দশ দিন ছিলাম। বৃহৎ সি-বিচ মেরিনাতে কয়েকবার গেলাম। হাঙ্গরের ভয়ে পানিতে নামতে পারিনি। প্যাকেজ টুরের মাধ্যমে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা ঘুরলাম। ফেরার পথে পুরী নামলাম। অশোক তখন কটকে। আমরা কটক থেকে অশোককে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ফিরলাম।

হাওড়া থেকে আমার হোটেলে চলে এসেছি। আর ওরা গেছে শেওড়াফুলি। এরপর কয়েক দিন কলকাতা ছিলাম। জয়ন্তী প্রায় প্রত্যেক দিনই আসতেন।

এতো দিনে আমরা একজন আরেকজনের অনেক কাছে এসেছি। কবে যেন আপনি থেকে তুমিতে পৌছেছি বুঝতে পারিনি। মন ভালো থাকলে জয়ন্তী যখন-তখন গুনগুন করে গান করতে থাকে। তার গানের গলা খুবই মিষ্টি। তার গলায় দুটি গান অহরহ শুনতে পাই, *কে প্রথম ভালোবেসেছে, কে প্রথম কাছে এসেছে, সে তুমি না আমি...*। আর অন্যটি *যতোক্ষণ কাছে আছো মনে হয় দেহে প্রাণ আছে, বাকিটা সময় যেন মরণ আমার...*। মাঝে মধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করে বলতেন, এ গান দুটি কোন ছায়াছবির এবং কে গেয়েছেন।

বলতে পারিনি।

কলকাতা ছাড়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সে আমার সঙ্গেই থাকলো। বিদায় বেলায় তাকে কথা দিতে হলো, আগামী বছর এ সময় আসছি এবং এবারের যাত্রা হবে দার্জিলিং হয়ে নেপাল-ভুটান পথে।

১৯৮৫ সাল থেকে ২০০৫ সাল। বিশ বছর অনেক সময়। এই দীর্ঘ বিশ বছরে আমার আর জয়ন্তীর বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় হয়েছে। যতোই বয়স বাড়ছে ততোই আমার ওপর সে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বিশ বছরে সতেরোবার জয়ন্তী আমার সঙ্গে মুম্বাই, মাদ্রাজ, গোয়া, কাশি, বৃন্দাবন, আগ্রা, জয়পুর, দিল্লি, হিমাচল

প্রদেশসহ ইনডিয়ার অনেক জায়গায় ঘুরেছে। মনে হয় দুজনার মধ্য থেকে একজনের এ পৃথিবী থেকে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত এ প্রোগ্রাম চলতেই থাকবে।

সংসারেও পরিবর্তন এসেছে।

মাধুরী তার স্বামীর সংসারে ফিরে গেছে এবং সুখেই আছে। এখানে আমার কিছু ভূমিকা ছিল। আমি যেকোনোভাবেই হোক অশোকের মা, বোনদের ম্যানেজ করেছি। এ জন্যে কাকিমা, মাধুরী দুজনেই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ।

১৯৯৬ সালে কমলেশ মারা গেছে। তার মৃত্যুতে কাকিমা একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। বয়স বাড়ছে। এখন তার একমাত্র অবলম্বন জয়ন্তী। দুই বিধবা দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

কাকিমা প্রায়ই বলেন, এতো দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ভগবান কেন যে আমাকে বাচিয়ে রেখেছে! এ জন্যেই বোধহয় ভগবান তোমাকে মিলিয়ে দিয়েছে। অনেকেই জানে তুমি আমার আরেক ছেলে, বাংলাদেশে থাকো। আর বর্তমান কথা কি বলবো। সে তো জীবনে কিছুই পেল না। শুধু দিয়েই গেল। কমলেশ বেচে থাকতেই বলেছিলাম একটা দত্তক নিতে। কিন্তু কমলেশ রাজি হলেও বৌমা রাজি হলো না।

জয়ন্তীর জীবন বড় বেদনাদায়ক। একটু একটু করে সে তার জীবনের করুণ কাহিনী আমায় জানিয়েছে। গরিব বাবা-মায়ের ঘরে তার জন্ম। তারা পাচ বোন, কোনো ভাই নেই। বাবা বেসরকারি অফিসের টাইপিস্ট। কোনোভাবে সংসার চলে। জয়ন্তীর বয়স যখন পাচ বছর তখন তাদের দূরসম্পর্কের এক বড়লোক আত্মীয় তাকে দত্তক নেয়। ছোটবেলা থেকেই সে সুন্দরী।

যখন তাকে প্রথম দেখি, মনে হচ্ছিল আমি যেন বাংলা চিত্রজগতের নায়িকা সুপ্রিয়া দেবীকে দেখছি।

দুর্ভাগ্য তার। দত্তক নেয়ার দুই বছরের মধ্যেই দত্তক বাবা মায়ের ঘরে সন্তান এলো। যদিও দীর্ঘ দিন তারা নিঃসন্তান ছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তাদের আরো একটি সন্তান হলো। জয়ন্তীর অবস্থা তখন দুর্বিষহ। মা তো তাকে একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না।

বাবা বেচারার মধ্যে কিছু মনুষ্যত্ব ছিল। তিনি জয়ন্তীকে হস্টেলে পাঠিয়ে দিলেন।

এখানে থেকেই সে বিএ পাস করে এবং স্কুলে চাকরি পায়। তখনই কমলেশের সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

বিয়ের তিন বছরের মধ্যে কমলেশের জীবনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সে চির জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেল। জয়ন্তী কখনো হেসে, কখনো কেদে তার করুণ পরিণতির কথা শুনিয়েছে।

তার সব থেকে বড় ভুল সে কেন বিয়ের প্রথম দিকেই একটি বাচ্চা নেয়নি। তাহলে তো একটা অবলম্বন অন্তত থাকতো।

তার কথা, আমি তো ভাবতেই পারিনি কমলেশ এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। তুমিই বলো, এই যে আমি বেচে আছি, এটাকে কি বেচে থাকা বলে? আমার রূপ, যৌবন ছিল। আমার শিক্ষা ছিল। আমি একটা চাকরি করি। আমি তো কমলেশকে ছেড়ে চলে যেতে পারতাম, পারিনি। ওই দুটি অসহায় প্রাণীকে ফেলে কেমন করে যাই। একজন পঙ্গু আরেকজন বৃদ্ধা। আমার জীবন তো শেষ। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে কি করতাম জানি না। হয়তো কোনো অন্ধকার জগতে ঢুকে পড়তাম। প্রলোভন যে ছিল না তাও নয়। তবে তুমি আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাচিয়েছো, এটা স্বীকার করতেই হবে।

বার বার তাকে বলেছি, তোমার সত্যিকারের মা, বাবা, বোনেরা কোথায় আছে আমাকে বলো, আমি তাদের খুজে বের করবো। তার সেই একই উত্তর, যে বাবা-মা নিজের সন্তানকে বিক্রি করে তাদের খবর জানতে চাই না। যে কয়দিন বাচি, এভাবেই বাচবো।

এই দীর্ঘ সময়ে জয়ন্তীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠিটি ছিল এভাবে -

বিদেশি বন্ধু,

আমি এমএ পাস করেছি এবং স্কুলের চাকরি ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি। খবরটি কাউকে জানানোর জন্য মনটা খুব উথাল–পাতাল করছিল। কিন্তু কাকে জানাবো, কে আমার এ খবর শুনে খুশি হবে। আমার তো কেউ নেই। একমাত্র তুমিই আছো। তাই তোমাকে জানালাম।

ইনডিয়ার অনেক জায়গায় আমরা ঘুরেছি। ইনডিয়াতে তো মন্দিরের ছড়াছড়ি। আমি কখনো কখনো জানার এবং দেখার কৌতূহল নিয়ে অনেক মন্দিরে ঢুকেছি। কিন্তু জয়ন্তীকে কখনো কোনো মন্দিরে ঢোকাতে পারিনি। তার এক কথা, এসব দেব–দেবীদের কাছ থেকে কি পেয়েছি যে, এদের শ্রদ্ধা–ভক্তি করবো। আর এখন তো আমার হারানোরও কিছু নেই।

একবার দেখলাম এক মন্দিরের পাশেই একটা গাছের ডালে ভক্তরা মানত করে লাল সুতা বাধছে। হঠাৎ দেখি জয়ন্তীও একটা সুতা গাছের ডালে বাধলো। কাছে আসতে জিজ্ঞাসা করলাম, কি মানত করলে?

জবাবে বললো, দেবীকে বললাম, দয়া করে আমার জন্যে এ কাজটি অন্তত করো যেন আমি তোমার সঙ্গে মরতে পারি।

তাকিয়ে আছি দেখে ফের বললো, বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি সত্যিই এটা চেয়েছি। তোমার সঙ্গে আমি মরলে তুমি অন্তত জানতে পারবে, আমি নেই। সব থেকে ভালো হয় যখন তুমি এখানে থাকো তখন যদি আমার মরণ হয়। আমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে ওই গানটা, *চিতাতেই সব শেষ...* গাইতে গাইতে চলে যাবে।

আমি যদি আগে মরি তাহলে কি হবে? আমার প্রশ্ন।

এখানেই তো অসুবিধা। আমি তো জানতেই পারবো না তুমি নেই। ভাববো এ বছর আসতে পারোনি, আগামী বছর নিশ্চয়ই আসবে। এভাবেই দিনের পর দিন কেটে যাবে। যদি কখনো জানতে পারি তুমি আর নেই তাহলে হয় জলে ডুবে মরবো, না হয় সব ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাবো। তখন আমার কণ্ঠে শুধু একটা গানই থাকবে *আর জনমে আমরা হংসমিথুন ছিলাম, ছিলাম নদীরও চরে! যুগল রূপে এসেছিলাম...*।

এই বঞ্চিত, উপেক্ষিত নারীর এসব আবোল তাবোল কথার হয়তো কোনো গুরুত্ব নেই – কিন্তু কিছু না পাওয়ার বেদনা তাকে যে অহরহ কুরে কুরে খাচ্ছে এটা তো ঠিক!

জয়ন্তী প্রায়ই একটা কথা বলে, সেদিন যে তুমি জগন্নাথ এক্সপ্রেস মিস করেছিলে, এটাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তোমাকে দেখেই আমার নতুন করে বাচার সাধ জাগলো।

তার সব কথা একেবারে মিথ্যাও নয়। তার একটা অন্ধ ভালোবাসা বা ভালো লাগা যে আমার প্রতি আছে সেটা তার মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। এক বছর পর আমাদের দেখা হয়।

সেই এক বছর পর যখন সে আমাকে প্রথম দেখে বা তার কাছে আসি তখন তার চোখে মুখে যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়, কবি সাহিত্যিকরা তাকেই বুঝি বলে ভালোবাসার মুখ।

এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে

দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েংগে

- দ্রিমিত্রি

সেদিন বিকেলে ভাটিয়ারির রঙটা। কি যে অসহ্য সুন্দর লাগছিল। মনে হচ্ছিল এখানেই পাহাড়ের চূড়ায় কোথাও থেকে যাই। তালহা ওর বাইকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ভাটিয়ারির গলফ এরিয়াতে আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় এর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম আর ওকে বলছিলাম আমাকে এখানে একটা পাহাড় কিনে দাও। ওর রাম পেয়ারি বাইকটা মনে হচ্ছিল আমাদের নিয়ে একবার রাস্তার চূড়ায় উঠছে আবার ঢালুতে নামছে।

তখন শীতের সময় ছিল। তাই বিকেলটা খুব দ্রুতই শেষ হচ্ছিল। জানি আমাদের তাড়াতাড়ি ব্যাক করতে হবে। তবুও বললাম সানসেটটা দেখে যাবো।

আমরা দুজনে অনেকক্ষণ হাত ধরে চুপটি করে বসে সূর্যের চলে যাওয়া দেখছিলাম।

ও বলছিল, তোমার ট্রেন এগারোটা পচিশ মিনিটে। আমাদের মনে হয় যাওয়া উচিত এখন।

কিন্তু আমি এই অপার সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হতে চাচ্ছিলাম না।

রাত আটটা বেজে গেল। রাজশাহী থেকে ভালোবাসা দিবসে দেখা করার জন্য চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম। ওর ছুটি ছিল না। তাই এতো বড় জার্নির ধাক্কাটা আমাকেই মেনে নিতে হয়েছিল। ওর বন্ধু শাহনূরভাই, আমি, আমার কাজিন, আর ও এই চারজনে যখন স্টেশনে আসছিলাম তখন রাত প্রায় এগারোটা বেজে গিয়েছিল। আমরা যেহেতু অনেক দূরে থাকি সেহেতু বিদায়ের বিচ্ছেদটা কাটাতে সময় লাগছিল। আমি অঝোরে কেদে যাচ্ছিলাম।

ও আমাকে বোঝাচ্ছিল।

এই তো, ছুটি পেলেই আমি চলে আসবো। তা সাত দিনও হতে পারে বা ম্যাক্সিমাম পনেরো দিনও হতে পারে।

তখনো ও আমাকে রুমাল দিয়ে চোখ মোছাচ্ছে ট্রেনের বগির পাশে যে ছোট্ট জায়গা থাকে সেখানে দাড়িয়ে।

আমার কাজিন আর শাহনূরভাই সিটে বসে আছেন।

ও যখন ঘড়িতে এগারোটা বিশ মিনিট দেখলো তখন বললো, এখন সিটে বসো।

আমরা যখন বসতে গেলাম তখন একই টিকেট নিয়ে দুই ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হলেন।

ট্রেন মৃদু চলা শুরু করেছে। শুরু হলো কথা কাটাকাটি। এগারোটা চব্বিশ যখন বাজে, ট্রেন মৃদু থেকে একটু জোরে চলা শুরু করেছে।

বললাম, টিকেটটা একটু ভালো করে দেখো।

দেখা গেল আমাদের টিকেট গতকালের ছিল।

এটা ওর রানারের ভুল ছিল। আমরাও খেয়াল করিনি। তখন ট্রেন বেশ জোরে যাচ্ছে অর্থাৎ তখনই স্টেশন ছাড়বে। ওরা তিনজনই নেমে গেছে। আমি দরজায় দাড়ানো লাস্ট পার্সন। কিভাবে নামবো বুঝতে পারছি না। ট্রেন বেশ জোরে চলছে তখন। তার ওপর আমি হাই ছিল পরে আছি। কিভাবে কি করবো বুঝতে পারছি না।

ও বার বার করে বলছে, তুমি লাফ দাও, আমি ধরে নিচ্ছি।

দ্বিধায় আছি যদি পড়ে যাই! আবার নামতেও তো হবে। শেষে আল্লাহ আল্লাহ করে দিলাম লাফ।

ও আমাকে ধরা তো দূরের কথা, আমি ওকে ছুতেই পারলাম না, বরং প্ল্যাটফর্মে উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। মনে হয় কয়েক সেকেন্ড বুঝলাম না আমার অবস্থানটা কি?

একটু পরে দেখি ও কাদো কাদো অবস্থায় আমাকে তুলছে। কোথাও লাগলো কি না দেখছে।

পায়ে অনেকটুকু কেটে গেছে দেখলাম। ঠিকমতো হাটতে পারছিলাম না।

আর শাহনূরভাই এবং আমার কাজিনের সে কি হাসি!

পুরো প্ল্যাটফর্মের মানুষজনের দৃষ্টি আমার ওপর।

আমি অবশ্য ব্যথায় কাতর।

ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। আমাকে অ্যান্টি টিটেনাস ইনজেকশন নিতে হয়েছিল।

পরে আমরা সেই রাতেই বাসে উঠেছিলাম ঘণ্টা দুয়েক পরে। লাভের মধ্যে পাওয়া হলো ও ওর স্যারকে বলে ছুটি নিল আমাকে রেখে আসার জন্য।

শাহনূরভাই বাসে ওঠানোর সময় বললো, কি ভাবী! *দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েংগে*।

আর তখনই মনে হয় আমি সত্যিকারের লজ্জাটা পেলাম।

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম থেকে

সে নেই

- রীনা

জানুয়ারি ২০০১

বাচ্চাদেরসহ সিলেট যাবো। বললাম স্বামীকে।

দুই মাস আগে আমার শ্বশুর মারা যাওয়ার পর থেকে স্বামী আজকাল আর কোথাও যেতে চায় না। বললো, আমি এয়ার টিকেট করে দিই, তুমি বাচ্চাদের নিয়ে চলে যাও। অসুবিধা হবে না, পরিচিতরা আছে।

বাদ সাধলেন শাশুড়ি। বললেন, তিন বাচ্চা নিয়ে একা যাবে কেন? বাচ্চাদের জন্যই তো যাওয়া। তিন ছেলে আমাদের। বড়টা ষোল বছর। ও লেভেল দেবে। ৮ তারিখ থেকে পরীক্ষা। ছোট দুটো টুইন, আট বছর।

ঠিক হলো ১২ তারিখ রাতে আমরা সিলেট যাবো ট্রেনে। আমাদের বড় ছেলের পরীক্ষা শেষ হলে ৬ তারিখ। আমি অফিস থেকে ফিরলে ও বললো, টিকেট করে এনেছে ১২ তারিখ রাতের। এবং বললো, তার কোটের পকেটে আছে ওগুলো।

আমি তখন WHO-তে চাকরি করি।

৭ তারিখে আমি ফিরলে সে বললো, তার শরীর ভালো লাগছে না। পরদিন ছেলের পরীক্ষা সেটা নিয়েও কথা হলো। ড্রাইভারকে পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি আসতে বলে শুয়ে পড়লো। আর আমাকে বললো কিছুক্ষণ তার পাশে বসতে।

প্রেশার দেখলাম একটু বেশি। বললাম তাকে।

বললো, ঠিক বলেছো তো?

রাগ করলাম।

বললো, রাগ করো কেন?

আমরা ডাক্তাররা সব সময় পেশেন্টকে সত্যি বলি না।

তারপর সে ঘুমিয়ে পড়লো। অশান্ত থাকলো সারা রাত। পরদিন সকালে আরো অসুস্থ হলো সে।

সেদিন ছেলের পরীক্ষা। বড় ছেলেকে ডেকে কিভাবে উত্তর দিতে হবে, কি করা যাবে না এসব বুঝিয়ে বললো। তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতাল ছোটাছুটি করলাম সারা দিন। কারণ সেদিন বিশ্ব ইজতেমার আখেরি মোনাজাত। সবাই মোনাজাত করতে গেছে।

ছেলে কার সঙ্গে পরীক্ষা দিতে গেছে জানি না।

বিকাল সাড়ে চারটায় সে আমাকে আর তিন বাচ্চাকে ছেড়ে চলে গেল অন্য জগতে।

সন্ধ্যায় পরীক্ষা দিয়ে ফেরা ছেলে পেল সকালে তাকে উপদেশ দেয়া চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে যাওয়া বাবাকে।

৯, ১০, এবং ১১ তারিখ সে অপেক্ষা করলো সিএমএইচ-এর হিমাগারে লন্ডন থেকে আসা তার ভাইয়ের জন্য। আর ১২ তারিখ অপেক্ষা করলো তার ছেলের পরীক্ষা শেষ হবার জন্য।

১৩ তারিখে তাকে চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়ানো হলো সামরিক কবরস্থানে।

সে সিলেট যেতে চায়নি। তাই কি একেবারেই চলে গেল অন্য জগতে? ১২ তারিখে সিলেট যাবার টিকেট এখনো তার পকেটে সেভাবেই ঘুমিয়ে আছে যেভাবে সে ঘুমাচ্ছে।

নভেম্বর

দেশে কোথাও কিছু ভালো লাগে না। তাই WHO-র কনট্রাক্ট রিনিউ না করে চলে এলাম মালয়শিয়াতে কোনো এক ইউনিভার্সিটিতে চাকরি নিয়ে। একা আমি, সঙ্গে আমার তিন ছেলে। বিশাল কুয়ালা লামপুর

এয়ারপোর্টে আমাকে এক টার্মিনাল থেকে আরেক টার্মিনালে যেতে হবে ট্রেনে। কারণ আমার গন্তব্য আরো এক ঘণ্টা পরে ডমেস্টিক ফ্লাইটে। ট্রেনে উঠে গেছি আমরা। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার যমজ দুটির একটা উঠতে পারেনি ইলেকট্রিক ট্রেনে। থামানোর কোনো উপায় নেই।

আমি এক অসহায় মা তাকিয়ে দেখছি আমার ছেলেকে ফেলে চলে যাচ্ছে ট্রেন। আর সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে যে, তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে তার মা আর ভাইয়া অন্য কোথাও।

কি হচ্ছিল তার মনের ভেতর তখন জানি না। সে এক দুঃসহ কষ্ট এবং কিছু করতে না পারার যন্ত্রণা। ওই ট্রেনেই ফিরলাম আবার আগের টার্মিনালে। দেখি তখনো সে তাকিয়ে আছে তাকে ফেলে চলে যাওয়া ট্রেনের দিকে। নেমে তাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং মনে মনে আল্লাহকে বললাম, এর চেয়ে কষ্টকর কোনো অভিজ্ঞতা তুমি কখনো আর আমাকে দিও না।

এখন লিখতে বসে সেই যন্ত্রণা আমার আবার ফিরে আসছে।

এখন ২০০৫ সাল।

ওরা বড় হয়েছে, এখন একাই যেতে পারে বাংলাদেশে। তারপরেও আমি ওদের সংগে কুয়ালা লামপুর পর্যন্ত যাই।

ভয় হয় এখনো। ফিরে আসে সেই অল্প সময়ের ট্রেন ভ্রমণের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।

জীবন চলে তার মতো। আমারটাও চলছে নানান রকম অভিজ্ঞতা, আনন্দ আর বেদনা নিয়ে ট্রেন ভ্রমণের মতো।

শুধু সে নেই।

মালয়শিয়া থেকে

বাস্তবতা

– ফেরদৌসী চৌধুরী

ট্রেন ভ্রমণ আমাদের জন্য একটি সাধারণ ব্যাপার। কারণ আমাদের উত্তর অঞ্চলে যেতে যমুনা ডিঙিয়ে যেতে হয়। তাই প্রতিবারই ঈদ থেকে যখন বাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন তখন আমরা ট্রেনেই যাই। সবাই মিলে যাওয়ার সে কি আনন্দ। যাক সে কথা। নির্দিষ্ট দিনে রওনা দেয়া গেল।

তারিখটা স্পষ্ট মনে নেই। কিন্তু দিনটার কথা মনে আছে। খুব আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। ভ্রমণের ঝক্কুর ঝক্কুর শব্দে মন হারিয়ে ফেললাম। পাশে স্বামী ভদ্রলোকটি ঘুমিয়েছিলেন।

হঠাৎ খেয়াল করে দেখি এক ভদ্রলোক সামনে বসা। দুই একটি দাড়ি গোফ পেকে যেতে ধরেছে। তবুও হ্যান্ডসাম ভদ্রলোকটিকে ভালো লাগলো দেখতে।

তখনো বুঝে উঠিনি ভদ্রলোক আমারই মৃত ভালোবাসা।

জীবনের কিছুটা শান্তির বাতাস ট্রেনের জানালা দিয়ে হঠাৎ এলো মনে হলো।

এতোদিন পর কাকে দেখছি!

কাকে দেখছি!

নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। তারপরও চোখকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে চেয়েই রইলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যাবেন কোথায়?

তিনি উত্তর দিলেন বগুড়া।

নিশ্চিত হলাম।

আবারও প্রশ্ন করলাম। এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা?

নামটা শোনার পর কি যে আনন্দ লাগছিল তা বোঝাতে পারবো না।

নিজেকে আড়াল করে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হলাম। ও আমাকে চিনতে পারেনি। বেশ জোরেসোরেই স্মৃতির পাতা রোমন্থন করতে করতে তার সঙ্গে আলাপ করছিলাম। এতো বছরের জমাট বাধা কথাগুলো বলতে বলতেই ও আমাকে চিনতে পারলো। অব্যক্ত আনন্দে বার বার শিহরণ লাগছিল।

এদিকে ঘাটে এসে গেলে ফেরিতে ওঠার জন্য দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে। আমিও যেন সবাইকে ছেড়ে আনন্দে ফেরিতে উঠলাম। ওঠার পর ওকে অনেক খুজেছি। পাইনি। পাওয়া হলো না। খুজতে খুজতে আবার দুরু দুরু ভয় হয়, জীবনসঙ্গী ভদ্রলোকটি যদি দেখে ফেলে!

এই তো আমার কিছু স্মৃতি বিজড়িত ট্রেন ভ্রমণে একটি কাহিনী। ট্রেনে ভ্রমণ না করলে হয়তো ওর সঙ্গে কোনোদিন দেখা হতো না। বাস্তবিকই ওই ট্রেন ভ্রমণ আমার স্মৃতিপটে স্মরণীয়।

তবে ওর সঙ্গে যতোই আলাপ করি, আনন্দিত হই, আমার মধ্যে বিবেকের দংশন হচ্ছিল। কেন একজনের ঘরণি হয়ে অন্যজনের সঙ্গে এতো খোশ আলাপ?

বিবেকের তাড়নায় স্মৃতিকাতর একজন মানুষ হয়েও ওকে ভোলার চেষ্টায় অস্থির হয়ে গেলাম।

জীবনের ধারাবাহিকতায় মানুষকে পরিবর্তিত হতে হয়। এটাই নিয়ম, এটাই জীবন, এটাই বাস্তব।

নির্দিষ্ট সময়ে আমরা বাড়ি পৌছালাম। মানুষের ছোট্ট জীবন। এই ছোট্ট পরিসরের জীবনেও মানুষ অনেক সময় কিছু অপ্রস্তুত অবস্থার শিকার হয়।

তবে ওকে দেখে ব্যথা বেদনা ভুলে আনন্দিত হলেও আমাকে বা একজন মানুষকে বিবেক কতোখানি জাগ্রত করতে পারে সেই অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে।

বলা বাহুল্য, ট্রেন ভ্রমণের কারণেই আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে।

মধ্য বাংলা থেকে

ডাইল

- একেএম আহসান উল্লাহ

ব্র্যাকের প্রধান কার্যালয়ে গবেষণা বিভাগে কাজ করি। এই সুবাদে দেশের প্রায় সব কয়টি জেলা দেখতে পেরেছি। নব্বই-এর মাঝামাঝিতে গবেষণা বিভাগ মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য নিয়মিত একটি কর্মশালার আয়োজন শুরু করলো।

সকালবেলা আমরা রওনা হলাম চিটাগাং থেকে। বিভিন্ন স্টেশনে থামছে ট্রেন, যাত্রী উঠছে-নামছে আবার ট্রেন ছাড়ছে। কিন্তু এক সময়ে লক্ষ্য করলাম, ট্রেন যেসব স্থানে থামছে সেগুলো কোনো স্টেশন নয়।

গুনলাম স্টেশন ছাড়া ট্রেনটি থামলো আটবার। এসব স্থান থেকে কোনো যাত্রী নামছে না, শুধু উঠছে। সেই যাত্রীদের অধিকাংশই মহিলা। তাদের আছে বিশাল আকৃতির পেট। একত্রে পাচটা শিশু পেটে থাকলেও পেট অতো বড় বানানো যায় না। তাও সবার পেট একই রকম হতে যাবে কেন? অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি।

অন্যদের কাছে ব্যাপারটা যেন খুবই স্বাভাবিক। সবাই নিরুদ্বেগে ছুটছে ঢাকা। কেউ চিনাবাদাম চাবায়, কেউ ঝালমুড়ি-চানাচুর। এই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেরি হচ্ছে তাতে কারো কোনো মাথা থামানো নেই, কোনো রাগ নেই, নেই উত্তেজনা।

আমার কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে পাশের একজন মুখ এগিয়ে বললো, *প্যাডে ডাইল*।

ডাইল?

আকাইশদ্যা পড়ছেন মনে অয়। ইনডিয়া থেইকা দেশে ডাইল পাচার হইতাছে। এইবার বুঝতাছেন? নাকি এহনো বোঝেন নাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কিছু বলে না?

কে কইবো? ইক কইবো? জানে মাইরা হালাইবো না?

বুঝতে পারলাম লাখ লাখ বোতল ফেনসিডিল কিভাবে দেশে ঢোকে। শুধু বুঝলাম না সরকারি প্রতিষ্ঠানের ট্রেন থামিয়ে, হাজারো যাত্রীর লাখ লাখ ম্যান–আওয়ার নষ্ট করার নিত্য এই ঘটনায় প্রতিটি যাত্রীর নীরবতা কার ভয়ে?

প্রবেশদ্বার বন্ধ না করে মাঝে মধ্যে ঢাকার বস্তি থেকে বিশ বাইশ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে কি সমাজকে নেশামুক্ত করা যাবে?

১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটিতে একটি সম্মেলনে পেপার প্রেজেন্ট করতে গিয়েছিলাম ট্রান্সফরম ইন্টারন্যাশনালের আমন্ত্রণে। লন্ডনের ইউস্টন স্টেশন থেকে বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটিতে যেতে ট্রেনে কতো ঘণ্টা সময় লাগে সঠিক মনে নেই। তবে যাওয়ার পথে চার পাচবার এনাউন্সমেন্ট শুনলাম, আমরা দুঃখিত, ট্রেন বার্মিংহাম স্টেশনে পৌছাতে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে পাচ মিনিটের মতো বেশি সময় লাগবে। কারণ পুরো পথ ঘন কুয়াশায় ঢাকা। বার্মিংহামগামী কুয়াশায় ঢাকা ট্রেনে এই এনাউন্সমেন্ট শুনে আমাদের সেই সাধের ট্রেন ভ্রমণের কথা মনে পড়ে।

হংকং থেকে
akmahsanullah@gmail.com

প্রতারণা ইনডিয়ান স্টাইল

- মির্জা মতিউর রহমান

বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ–এর নয়নাভিরাম দৃশ্যগুলো মনকে এক সময় ভীষণ টানতো। হাওড়া স্টেশন থেকে দীর্ঘ বাহাত্তর ঘণ্টার জার্নি শুরু হতেই মন পুলকে ছেয়ে যেতো। দিন–রাতের বেশি সময় আমার জানালার ধারে বসেই কাটতো। উড়িষ্যার সমতল ভূমিতে সবুজের সমারোহ, মধ্যপ্রদেশের মাটির শক্ত পাহাড়, কপিলাপাস, কটকের বর্তমান রাজধানী ভুবনেশ্বর, চিল্কা, হৃদয়ের অসীম জলরাশি, ভেড়িবাধ দিয়ে মৎস্য প্রকল্প, শ শ জেলে ডিঙি নৌকায় মাছ ধরছে। ঝাকে ঝাকে অজানা পাখি উড়ছে। মহানন্দা নদীর ওপর ব্যারাজ। কোনো কিছুই মিস করতে চাইতাম না। তাই নিচের বার্থের রিজার্ভেশন পেতে সচেতন থাকতাম। আর এ ব্যাপারে ইনডিয়ান রেলওয়ের রিজার্ভেশন কর্মকর্তাদের সহযোগিতাও ভোলার নয়।

১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত ছেলে লেখাপড়া করতো তামিলনাড়ুর MGR–এ। আর মেয়ে লেখাপড়া করতো ২০০০ সাল থেকে কর্নাটকের রাজধানী ব্যাংগালোরে। ওদের খোজ খবর, বিশেষ করে, মেয়েকে আনা–নেয়ার জন্য বছরে দুই তিনবার আমাকে বাংলাদেশ টু দাক্ষিণাত্য এই লম্বা জার্নি করতেই হয়।

প্রথমদিকে কলকাতার হোটেলে উঠে রিজার্ভেশনের জন্য দুই একদিন হোটেলে প্রতীক্ষা, অতঃপর দালালের মাধ্যমে দেড় দুইশ রুপি সেলামির মাধ্যমে টিকেট নিতাম। পূজার মরসুমে এই সেলামির রেট প্রতি টিকেট চার পাচশ রুপিতেও উঠতো।

এই কয় বছরে লং জার্নি আর বেহাল খরচের হ্যাবা সামলাতেই হয়। তবে ওই যে, প্রয়োজনই পথ দেখায়। গিন্নি মমতার টিপ্পনি, যাক, এই আটষট্টি বছর বয়সে এসে একটু চালাক হলে শেষ পর্যন্ত।

ঘটনাটা এ রকম :

বর্ডার পার হয়ে বেবিট্যাকসি নিয়ে সোজা কলকাতা *ফেয়ারলি প্যালেস*–এ চলে যাই। ফরেন কাউন্টারে দাড়িয়ে পাসপোর্ট দেখাই।

রিজার্ভেশন ফরম পূরণ করে ওনারাই দেখিয়ে দেন Senior Citizen Country যেখানে ষাটউর্ধ বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং বিকলাঙ্গদের জন্য স্পেশাল কোটায় রিজার্ভ টিকেটের ব্যবস্থা আছে। ষাটঊর্ধ হলে তাদের জন্য শতকরা দশ ভাগ ডিসকাউন্ট!

২০০৪ সাল মেয়ের পরীক্ষা শেষের দিকে মেয়ে ফোন করেছে, তাই আনতে যেতে হবে। বেনাপোল বোর্ডার পার হয়ে বেবিট্যাকসি নিয়ে সোজা ফেয়ারলি প্যালেস। রিজার্ভ কনফার্মড। লোয়ার বার্থ টিকেট পেয়ে মনটা বেশ ফুরফুরে। কারণ দুই এক দিন হোটেলে থাকতে হবে না। নো দালাল বিজনেস। বেশ কয়েকশ রুপি সাশ্রয়। তাছাড়া দুইটা দিনও বাচলো।

ফেয়ারলি প্যালেসের সামনের গলিতে নগেনদাদার *রাধে গোবিন্দ* হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে সোজা হাওড়া স্টেশন। ট্রেন ছাড়বে রাত পৌনে এগারোটায়।

রিজার্ভেশন চার্টে বগি নাম্বার, সিট নাম্বার, বার্থ নাম্বার চেক করে নিয়ে বগিতে উঠে বসলাম।

আমার সামনের লোয়ার বার্থে ত্রিশোর্ধ এক মহিলা টাইট ফিট জিনস পরনে, গায়ে ব্লাউজ ধরনের গেঞ্জি, কাধ পর্যন্ত কাটা চুল, উচু লম্বায়, অবাঙালি মনে হচ্ছে। তবে কোনো অরিজিন ধরতে পারছিলাম না। কফিওয়ালাকে হাক দিলাম।

দুই কাপ কপি দিয়ে গেল। তাকে অফার করলাম।

থ্যাংকস বলে নিলেন। জানালেন তিনি মিস সীতা নাগরাজ, কেরালার অধিবাসী, ব্যাংগালোর যাচ্ছেন তার কর্মস্থলে। সেন্ট জর্জ কলেজের তিনি কমপিউটার অধ্যাপিকা।

নিজের পরিচয় দিলাম। তারপর গুডনাইট বলে চাদরে মুখ ঢেকে এক ঘুমে রাত শেষ।

ঘুম ভাঙলো চা, কফির হকারদের চিৎকারে।

বাথরুম, টয়লেট সেরে, বুফে কারে গিয়ে নাশতা সেরে সিটে বসলাম। সিটে বসার আগে টয়লেটে বসেই সকালের বরাদ্দ সিগারেট শেষ করে এসেছি। কারণ ট্রেনে ধূমপান নিষিদ্ধ এবং সিকিউরিটির হাতে ধরা পড়লে নগদ পাচশ রুপি জরিমানা।

লাঞ্চ চাই বলে রেলওয়ের পোশাক পরা ব্যাজ, নেমপ্লেট লাগানো সার্ভাররা, চাহিদা মোতাবেক লাঞ্চের অর্ডার নোট করছে এবং টাকা জমা নিচ্ছে, সিট নাম্বারও লিখে নিচ্ছে।

আমি অর্ডার দিতে যাচ্ছি।

আমার সহযাত্রী বললেন, আমারটা তিনি দিয়েছেন আমাকে না জাগিয়ে। অনেক সকালে ইউনিফর্মধারী একজন স্টাফ এসেছিল, তার কাছে আমাদের বগির অনেকেই অর্ডার দিয়েছেন।

জানালার পাশে বসে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছি। কখনো সঙ্গে আনা বইপুস্তক, ম্যাগাজিন পড়ছি। এ দীর্ঘ যাত্রা যেন শেষ হতে চায় না।

আরো এক রাউন্ড কফি হলো। দামটা অবশ্য সহযাত্রী সীতা নাগরাজই পরিশোধ করলেন।

গল্প করছি তার সঙ্গে।

বিভিন্ন ইউনিফর্মধারী সার্ভাররা লাঞ্চ পরিবেশনে ব্যস্ত।

আমরাও নড়েচড়ে বসলাম। আমাদের বগিতে দুই চারজন লাঞ্চ সারছে। আমরা সবাই প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু দুইটা বেজে গেল, খাবার আর আসে না। পাশের কম্পার্টমেন্টের এক প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে জানা গেল যে, তার নেমপ্লেটে নাম ছিল কার্তিক। প্রায় পুরো ট্রেনের সব কম্পার্টমেন্ট থেকে সে নকল সাজে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

আমরা গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। জানা গেল সিকিউরিটিসহ সব জায়গায় ইনফরমেশন দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। পুরা ট্রেনের সব বগিতে প্রতারণা করে সে মোটা টাকা নিয়ে সটকে পড়েছে।

নাটাইপাড়া, বগুড়া থেকে

চুমু

– মোহাম্মদ ইলতাজুর রহমান লালন

আমাদের বিয়ের পরে আমার স্ত্রী বায়না ধরলো তাকে নিয়ে ট্রেনে চড়ার। এদিন–সেদিন করে তাকে অনেক দিন ঘোরালাম। এই জন্য সে আমার ওপর অনেক রাগ করলো। তাই এ রাগ ভাঙানোর জন্য তাকে সিলেট নিয়ে যাবো বলেছিলাম ট্রেনে চড়ে।

নির্দিষ্ট সময়ে টিকেট কেটে আমি আর আমার স্ত্রী অপেক্ষা করছি কখন ট্রেন আসবে।

দশ মিনিট অপেক্ষা করা শেষ। কিছুক্ষণ পরে স্টেশন মাস্টার বললেন, আরো আধ ঘণ্টা লেট হবে।

বসে, দাড়িয়ে থেকে যেন সময় আর শেষ হচ্ছে না। আমার স্ত্রীর ওপর এখন আমার খুব রাগ হলো।

তার সুন্দর ও মায়াবী মুখ দেখে আমার রাগটা চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে ট্রেন এলো। ট্রেনে উঠে আমাদের সিটে গিয়ে বসলাম।

ট্রেন ছাড়ার এক দুই মিনিট আগে আমার খুব ঠাণ্ডা পানীয় খেতে ইচ্ছা করলো। তাই আমার স্ত্রীকে বলে ঠাণ্ডা পানীয় আনতে যাই। এর মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দেয়। ট্রেনে উঠে যাই, তবে অন্য বগিতে।

ইতিমধ্যে ট্রেন খুব জোরে চলতে শুরু করে। আমার ভালোবাসার স্ত্রী আমাকে পাগলের মতো খুজতে থাকে। হয়তো তাকে ট্রেনে চড়ার একটা শিক্ষা দেয়ার জন্য এ রকম করেছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে তার কাছে যাই। সে যেন আমাকে পেয়ে আকাশের চাদ হাতে পেল।

তারপর সবার অজান্তে সে আমাকে একটি চুমু দিল।

নোয়াখালী থেকে

গোলাপি জন্মেছে ট্রেনে

– উম্মে কুলছুম মুননি

হঠাৎ করেই আমার বিয়েটা হয়ে গেল। ছেলে মফস্বলে থাকে।

বিয়েতে ভাইয়াদের অমত থাকলেও মায়ের সিদ্ধান্ত কেউ উপেক্ষা করতে পারেননি।

যা হবার তাই হলো। আমাকেও মফস্বলে থাকতে হবে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির সবার আন্তরিকতায় আমার সমস্ত মন খারাপ উবে গেল। বিশেষ করে আমার শ্বশুর। এতো সুন্দর তার কথা। এতো সহজে আমাকে আপন করে নিয়েছেন। আমি সত্যি অভিভূত। আমার মনে হলো, হি ইজ জাস্ট লাইক মাই ফাদার।

মাস্টার্স ফার্স্ট পার্টে পড়ছি। পড়লেখা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। ফলে বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি এর মাঝেই রয়েছি।

ফেনী থেকে চট্টগ্রাম। যাওয়া–আসার মাধ্যম হিসেবে ট্রেনকেই ফেভার করি বেশি। কারণ কমফোর্টেবল, যানজট বিহীন এবং অল্প সময়েই পৌছে যাওয়া যায়। কিন্তু ট্রেন ভ্রমণের বিড়ম্বনাও কম নয়। রেল কর্তৃপক্ষের সময়জ্ঞান খুবই কম। কখনো দেখা যায় তীর্থের কাকের মতো বসে আছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখন ট্রেন আসবে জানি না। কতোবার যে ট্রেন মিস করেছি তার হিসাব নেই। এই আসা–যাওয়ায় কতো বিচিত্র মানুষকে দেখেছি। সম্মুখীন হয়েছি বিচিত্র সব ঘটনার।

২০০০ সাল। সকাল পৌনে আটটায় *মেঘনা এক্সপ্রেস*। স্বল্প সময়ের জন্য ট্রেন ফেনী স্টেশনে থামে। ট্রেন এসে থামতেই হুড়মুড় করে সবাই নামতে চায় ও উঠতে চায়। আমার মহা বিরক্ত লাগে। আরেকটু বেশি সময় ধরে

থামলে কি হয়! ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেট করে, তখন কিছু হয় না। শুধু স্টেশনে বেশি সময় থামতেই তাদের যতো আপত্তি। আর উঠতে–নামতে ধাক্কা–ধাক্কি তো হয়েই যায়।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। শরতের মিষ্টি রোদ জানালা দিয়ে উকি দিচ্ছে। দুধারে অবারিত মাঠ, ধানক্ষেত। নদী–পাহাড় সবই ট্রেনের সঙ্গে চলতে শুরু করেছে। এদের যতো দেখছি ততোই মুগ্ধ হচ্ছি। প্রতিবারই এরা আমার কাছে নতুন রূপে আবির্ভূত হয়। কখনো সোনালি ধান, কখনো সবুজ মাঠ, কখনো বা ধান কাটা খালি মাঠ, কখনো শুকিয়ে যাওয়া নদী, কখনো বা বর্ষার ভরা যৌবনা উন্মত্ত উত্তাল নদী। এদের মাঝে এসে পাগল হয়ে যাই। ইচ্ছা করে নেমে পড়ি। বাচ্চাদের মতো হুড়োহুড়ি খেলি। লুটিয়ে পড়ি সবুজের বুকে।

এতো সুন্দর কেন! এতো রঙ কেন চারদিকে? কোথাও সোনালি, কোথাও সবুজ, হলুদ। সোনালি রোদের ছোয়ায় নদীর পানিগুলো কেমন চক চক করছে। সব কিছুকে আমার খুব আপন মনে হলো। পুরোপুরি ডুবে গেলাম আপনের মাঝে। ইচ্ছা হচ্ছিল রেলগাড়ির দরজায় দাড়িয়ে লিওনার্দো ডি ক্যাপৃও এবং কেট উইন্সলেট–এর মতো দুহাত দুদিকে প্রসারিত করে পেট ভরে অক্সিজেন নিই। আমার স্বামী বেচারা ঠিক সময় মতো আমার লাগাম টেনে ধরেছিল। নয় তো ইচ্ছা নামের পাগলা ঘোড়া আমাকে কোথায় নিয়ে যেতো আল্লাহ মালুম।

হু হু করে হিমেল বাতাস বইছে। মাথাটা বাইরে দিয়ে বসে আছি।

আমার স্বামী আমাকে কল্পনার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনলো।

ঠাণ্ডা লেগে যাবে। মাথাটা ভেতরে নিয়ে এসো।

আয়েশে ওর কাধে মাথাটা এলিয়ে দিলাম।

ও কি যেন বলছে।

কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার।

প্রকৃতির সম্মোহনী জাদুর ছোয়া আমাকে তখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে ঝমাঝম। আমার মনে হলো, এই পথ যদি শেষ না হতো কিংবা সময়টা যদি এখানে থমকে যেতো, কি মজাই না হতো! যাত্রীরা এ বগি থেকে ও বগি লোক আসা–যাওয়া করছে। যারা স্ট্যান্ডিং টিকেটে উঠেছে তারা সিটের সন্ধানে ছুটছে।

আমাদের সামনের সিটে এক কাপল বসেছে। মহিলাটি মনে হয় গর্ভবতী। খুবই সুন্দর। দুধে–আলতা গায়ের রঙ। জোড়া শাখা হাতে, চওড়া সিদুর মাথায়। মনে হচ্ছে কোনো মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী বসে আছে।

কেন জানি সিদুরের সৌন্দর্য অপূর্ব লাগলো।

আচ্ছা, মুসলমানরা কেন সিদুর পড়ে না? সিদুরে কি ধর্ম লেখা আছে? আমারও খুব সিদুর পরতে ইচ্ছা হলো। ধ্যাৎ আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? মাথায় আলতো চাপড় মেরে বাস্তবে ফিরে এলাম।

ভাব জমানোর চেষ্টা করলাম। ভদ্রমহিলা এবং তার স্বামী দুজনই অমায়িক। কথাবার্তা চলছে আমাদের। ভাবী সম্বোধন করলাম। আট মাস চলছে ওনার। তারও আমার মতো অবস্থা। বেড়ে ওঠা চট্টগ্রামে। বিয়ে হয়েছে ফেনীতে। মফস্বলের ডাক্তারদের ওপর কোনো ভরসা নেই। ভাবীর মা–বাবা মেয়ের ডেলিভারিটা চট্টগ্রামেই সারতে চান। অগত্যা চট্টগ্রাম যাত্রা।

কথোপকথনের এক পর্যায়ে লক্ষ্য করলাম, মহিলার মুখটি কেমন যেন মলিন হয়ে গেছে। মনে হয় কষ্ট হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করতেই বললো, ইটস ওকে।

আমাদের রেলযানটি মোস্তাননগর স্টেশন পার হয়ে এগিয়ে চললো চট্টগ্রামের দিকে।

ভাবীর চেহারা ক্রমেই মলিন থেকে বিকৃত হতে লাগলো। দাত মুখ বহু কষ্টে চেপে রেখেছেন। খুব অস্বস্তি বোধ করছেন মনে হয়। ভদ্রলোকের কানে কানে কি যেন বললেন। লোকটিও বিচলিত হয়ে উঠলেন।

এনি প্রবলেম ভাবি?

এবার মুখে নয়, মাথা নেড়ে নিষেধ করলেন। উঠছেন, বসছেন। বার বার স্বামীকে বলছেন, আর কতো সময় লাগবে?

কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলাম ভদ্রমহিলা আর বসছেন না। কোমরে হাত দিয়ে পেটটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় দাড়িয়ে আছেন।

স্বামী বেচারাও দাড়িয়ে আছেন পাশে।

আমিও দাড়ালাম। আলতো করে কাধে হাত রেখে বললাম, খুব কি কষ্ট হচ্ছে ভাবী?

আমার গায়ে এলিয়ে পড়ে বললেন, দিদি আমাকে বাচান। আমি আর পারছি না। আমাকে বাচান দিদি।

মহিলার করুণ আকুতি। মনে হয় লেবার পেইন। কি করবো বুঝতে পারছি না। কখনো এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। এতোটুকু ধারণাও নেই আমার। আমার স্বামীকে বললাম, যাও এ বগি, ও বগি। কোথাও ডাক্তার পাও কি না দেখো।

ও ছুটে গেল।

ভদ্রলোক হু হু করে কান্না জুড়ে দিলেন।

প্লিজ, কাদবেন না। একটু ধৈর্য ধরুন। আপনি ওনাকে ধরে বসুন, আমিও খোজ করে দেখি।

শুধুই দৌড়াদৌড়ি করলাম। কোনো লাভ হলো না। ডাক্তারের নাগাল পেলাম না। অসহায় বোধ করলাম।

মহিলার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। তিনি যেখানটায় বসেছেন তার চারপাশ পানিতে ভরে গেছে। মহিলার শাড়ি ভিজে জবজবে হয়ে গেছে।

চারপাশের মানুষ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হাসাহাসি, কানাকানি করছে। কিন্তু কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসছে না।

ভাবীর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমি কাছে আসতেই শক্ত হাতে চেপে ধরে কান্না জুড়ে দিলেন। কি করবো, চেইন টানবো কি? কিন্তু আশপাশে কোনো গ্রাম বা জনপদ চোখে পড়ছে না। এগিয়ে গিয়ে বগির বয়স্ক মহিলাদের সাহায্য চাইলাম।

বেশির ভাগই নাক সিটকে ফিরিয়ে দিলেন।

অবশেষে দয়া হলো। একজন এগিয়ে এলেন। ওনাকে দেখে আরো কয়েকজন সঙ্গে এলেন। ভাবীর অবস্থা দেখেই তৎপর হয়ে উঠলেন পাতানো খালাম্মা। বিছানা চাদর আছে কি না জানতে চাইতেই স্বামী বেচারা ব্যাগ খুলে দিলেন। কাথা কাপড়ের বিপুল সমাহার।

খুজে চাদর বের করলাম।

খালাম্মা আর কি লাগবে?

কাথা নাও কয়েকটা।

দুই সিটের মাঝের জায়গাতে মোটা করে অনেকগুলো কাথা বিছিয়ে দিয়ে ধরাধরি করে ভাবীকে শুইয়ে দিলাম।

খালাম্মা একটার পর একটা আদেশ দিয়ে যাচ্ছে।

সুবোধ মেয়ের মতো তা পালন করছি। বেশ অভিজ্ঞ মনে হচ্ছে খালাম্মাকে। মনে মনে স্বস্তি বোধ করলাম।

ভাবী দাত–মুখ খিচে যতোটা সম্ভব চিৎকার কন্ট্রোল করতে চাচ্ছেন। খালাম্মা গামলা, গরম পানি, সাবান ও পরিষ্কার ব্লেড চাইলো।

ট্রেনের খাবার পরিবেশনকারীদের সাহায্য চাইলাম।

সব সাহায্য করলো! ব্লেড কোথায় পাই? শেষে আমার স্বামীর নতুন রেজর বের করে দিলাম।

খালাম্মা বিছানা চাদর উচু করে ধরতে বললেন।

আমার স্বামী ও ভাবীর স্বামীকে ধরিয়ে দিলাম। আরেক খালাম্মা দোয়া দরুদ পড়ে ফু দিতে লাগলেন।

আমিও আমার জানা সমস্ত দোয়া কালাম পড়া শুরু করলাম।

ভাবী চিৎকার করেই যাচ্ছেন।

ধৈর্য ধরো মা। খালাম্মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

ঘড়িতে নয়টা বেজে পচিশ মিনিট হলো। ভাটিয়ারীর কাছাকাছি এসেছে ট্রেন।

যেই আমি আবেগের বাড়াবাড়িতে সময়কে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম সেই আমার ইচ্ছা করছে সময়ের কাটাটাকে আরেকটু সামনে এগিয়ে দিই।

ভাবীর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

ভদ্রলোক কেদেই চলছেন।

চিৎকারের মাত্রা আরো বেড়ে গেল।

আমারো দুই চোখ দিয়ে টুপ টুপ পানি পড়ছে ওনার কষ্ট দেখে।

অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। মাগো বলে জড়িয়ে ধরলেন খালাম্মাকে। ওয়া ওয়া চিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠলো চারপাশ। হেসে উঠলো সবাই। সাড়ে নয়টা। ফুটফুটে এক কন্যা শিশুর জন্ম হলো।

খালাম্মা দক্ষ হাতে নাড়ি কাটলেন। কাথায় মুড়িয়ে পিতার হাতে তুলে দিলেন বাচ্চাকে। আল্লাহর কাছে অনেক শোকর আদায় কররেন খালাম্মা। অতঃপর ভাবীকে কোনো রকমে ফ্রেশ করে নিচেই শুইয়ে রাখলাম।

পিতার কাছ থেকে কন্যাকে নিয়ে একে একে সবাই আদর করে দিল।

আমিও অনেক আদর করলাম। মায়ের কোলে দিয়ে বললাম, ভাবী, ওর নাম গোলাপি রাখবেন। *গোলাপি জন্মেছে ট্রেনে*।

সবাই উচুস্বরে হেসে উঠলো।

অভিজ্ঞ খালাম্মা খুবই সচেতন। শিশুটির গোলাপি বদনে কাউকে চুমু খেতে দিলেন না।

ট্রেন এগিয়ে চলছে। পাহাড়তলী এসে পড়েছে। খানিক বাদেই চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌছাবে।

শিশুটির পিতা সবাইকে আন্তরিকভবে কৃতজ্ঞতা জানালেন। এবং বাসায় যাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। মায়ের ইশারায় শিশুটির পিতা মায়ের পার্টস থেকে *ওম* চিহ্নিত একটি লকেট গোলাপির গলায় পরিয়ে দিলেন।

পাঠক, আপনারা কি খেয়াল করেছেন, হিন্দু ও মুসলমানের কি সুন্দর সহঅবস্থান!

ট্রেন স্টেশন এসে পৌছালো।

ভাবীকে ধরাধরি করে কাছাকাছি একটি ক্লিনিকে পৌছে দিলাম।

ভাবী হাতটা ধরে বললেন, দিদি, আপনি না থাকলে কি যে হতো! অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন।

কথা দিলাম সময় করে বাসায় যাবো।

গোলাপির পিতা–মাতার ধন্যবাদের বর্ষণে ভিজতে ভিজতে বিদায় নিলাম।

ফেনী থেকে

স্নেহমাখা তিরস্কার

– তাপস মোস্তাফা

তখন স্বৈরাচারী এরশাদের রাজত্বকাল। সারা দেশের মানুষ এরশাদ হটাও আন্দোলন করছে। পনেরো ও সাত দলীয় জোটের লেজুড় ছাত্র সংগঠনগুলোর জোটও আন্দোলন করছে। ১৯৮৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩–র ছাত্র আন্দোলনের তিন বছর পূর্তিতে (আমার নিজস্ব মত) পনেরো দল সমর্থক *ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ* ও সাত দল সমর্থক *সংগ্রামী ছাত্র জোট* ঢাকায় মহা ছাত্র সমাবেশের ডাক দিয়েছে। একই সঙ্গে পনেরো দল ও সাত দল ও ঢাকায় মহা সমাবেশ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে।

কলেজ পড়ুয়া ছাত্র হিসেবে ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আসছি। আন্দোলনে কোনো দলের সদস্য না হলেও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে ভালোবাসার কারণে জিয়ার দল বিএনপি সমর্থক জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে মৌন সমর্থন করি এবং আমার কলেজ (চট্টগ্রাম কলেজ) শাখার সভাপতি যিনি বর্তমান চট্টগ্রাম নগর শাখা বিএনপির নেতা যার স্নেহে পারিবারিক জীবন ছেড়ে কলেজ ছাত্রাবাসে থাকার যন্ত্রণা ভুলে থাকি তাকে বেশ পছন্দ ও সম্মান করি।

১০ বা ১১ ফেব্রুয়ারি সভাপতির কাছে মহা সমাবেশে যাওয়ার জন্য আবদার জানালাম।

তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে শেষে আমার আকার ও আয়তন (যা কলেজ ছাত্র হিসেবে ছোট ছিল)–কে কটাক্ষ করে বললেন যে, তুই মিছিলে গেলে হারিয়ে যাবি।

কিন্তু আমি তো নাছোড়বান্দা।

শেষে তিনি রাজি হলেন কয়েকটি শর্তে। *প্রথম শর্ত.* সঙ্গীদের কাছ থেকে দূরে যাওয়া যাবে না। *দ্বিতীয় শর্ত.* মিছিলে কলেজের সঙ্গী বড় ভাইদের যেকোনো একজনের হাত ধরে চলতে হবে।

১৩ ফেব্রুয়ারি রাত নয়টায় আমরা রওনা হলাম কলেজ থেকে চট্টগ্রাম রেলস্টেশন অভিমুখে। দশ বারোজনের দলটি স্লোগানমুখর হয়ে হেটেই স্টেশনে পৌছে গেলাম। স্টেশনে পৌছার পর সভাপতি আমাকে একটা বগিতে উঠিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিলেন সেখানে বসে থাকতে। তারপর প্ল্যাটফর্মে শুরু হলো বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ছাত্রদের মিছিল। স্লোগান শুনে মনে হলো আমাদের ঢাকা গমনের আগেই হয় তো এরশাদ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। কিন্তু নেতার আদেশ মেনে জানালা দিয়েই স্লোগান দিয়ে ক্ষান্ত থাকতে হলো।

এক সময় মিছিল শেষ হলো। সবাই বগিতে উঠে এলো। দেখা গেল কলেজ থেকে আসা দশ বারোজন ছাড়া কাউকে চিনি না। আর অন্যদের কাছেও আমি অচেনা। সভাপতির কাছে বসে থাকলাম।

পাশের সিটগুলো থেকে ভেসে আসতে লাগলো নানান সুরের নানান কথার গান। সুরে, বেসুরে সে গানগুলো বেশ মজা করে শুনতে থাকলাম।

দেখতে দেখতে ট্রেন ফেনী স্টেশনে পৌছে গেল। ট্রেন থামতেই সবাই হুড়মুড় করে প্ল্যাটফর্মে নেমে মিছিল শুরু করলো।

আস্তে করে নেমে আমিও মিছিলে শরিক হয়ে গেলাম। যেহেতু অতি উৎসাহী সেহেতু মিছিলে একাত্ম হয়ে গেলাম। হঠাৎ করে কিছু লোক মিছিলকে ধাওয়া করতেই মিছিল ছেড়ে সবাই ট্রেনে উঠতে ছুটলো। আমিও ছুটে ট্রেনে উঠে পড়লাম।

তেড়ে আসা লোকগুলো লাঠি–সোটা নিয়ে বগির বাইরে হম্বিতম্বি করছিল আর সবাই ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে তা ঠেকাচ্ছিল।

পরে শুনেছিলাম লোকগুলো ছিল ফেনীর মন্ত্রী কর্নেল জাফর ইমামের *টাইগার বাহিনী*–র সদস্য।

ইতিমধ্যে ট্রেন চলা শুরু করলো আর আক্রমণকারীরা ট্রেনে ঢিল ছোড়া শুরু করলো। আবশ্য তাতে কোনো সমস্যা হলো না দরজা জানালা বন্ধ থাকায়।

একটু পরই ঢিল পড়া বন্ধ হলো। তখনি আবিষ্কার করলাম, ভুল বগিতে উঠেছি।

বগির যাত্রী ছাত্ররা (ওরাও মিছিলে ছিল) আমাকে ওদের বগিতে আবিষ্কার করে চেপে ধরলো পরিচয়ের জন্য। যতোই কলেজ ছাত্র পরিচয় দিই ততোই তারা নাখোশ হচ্ছিল।

শেষে ওদের মধ্যকার নেতা গোছের একজন উদ্ধার করলেন। তিনি জানালেন যে, ওই বগিটি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির ছাত্রদলের জন্য রিজার্ভ করা। পেছনের বগিটি আমাদের। আমার হতচকিত অবস্থাকে তিনি তার ভালো ব্যবহার দ্বারা দূর করে জানালেন যে, এক বছর পর তো তুমিও আমাদের সহগামী হবে।

ওনাদের পাশে বসে এক সময় ভয় কাটিয়ে উঠেছিলাম। লাকসাম স্টেশনে ট্রেন পৌছার পর তাড়াতাড়ি নিজেদের বগিতে গেলাম।

প্ল্যাটফর্মে নেমে আগের মতো সবাই মিছিল করছিল।

কিন্তু সভাপতিকে দেখলাম ওনার আসনে স্থির বসে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি প্রথমেই বুকে টেনে নিলেন। তারপর শুরু হলো তিরস্কার। তবে সে তিরস্কার যে বড় ভাইয়ের স্নেহমাখা ছিল তাতে সন্দেহ ছিল না।

তিনি শান্ত হতেই দেখলাম মিছিল ছেড়ে সবাই বগিতে উঠছে আর ট্রেনও ছেড়ে দিল।

আমাকে ওনার কাছ থেকে আমার সহপাঠীরা পাশের আসনে নিয়ে গেল। তাদের কাছে ফেনী থেকে লাকসাম পর্যন্ত ওনার অস্থিরতার যে বর্ণনা শুনলাম তাতে অবাক হয়েছিলাম। এমনো নেতা হয়! সঙ্গীদের কেউই তার ধমক ও তিরস্কার থেকে রেহাই পায়নি আমাকে হারানোর জন্য।

সেই ১৯৮৬ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত কতোবার যে ট্রেনে চড়ে, কতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা বলে শেষ করার নয়। তবে এমনি স্নেহের পরশ আর কখোনা পাইনি। আজো শুনতে পাই সে স্নেহমাখা তিরস্কার।

শিবেরহাট, চট্টগ্রাম থেকে

মৃত্যু ঝুঁকি

- ফরিদ মাহমুদ

বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে ট্রেনই দূরপাল্লার যাত্রার আমার প্রিয় ও নিরাপদ বাহন। চেয়ার কোচে চড়তে আমার খুব ভয় লাগে। আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রী সংখ্যা বেশি থাকায় বেশির ভাগ সময় টিকেট পাওয়া যায় না। তখন যাত্রাবিলম্ব হয়।

ট্রেনের টিকেট পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। কাজে তাড়া থাকলে, টিকেটও পাওয়া না গেলে বাধ্য হয়েই বাসে চড়তে হয়। তখন বলতে পারেন, এক প্রকার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিই আসন্ন দুর্ঘটনার। বাসে ওঠার পথে দোয়া কালাম পড়ে নিই। হয়তো এই যাত্রায় আর বাসায় ফেরা সম্ভব হবে না। তবে পারতপক্ষে বাসে উঠতে চাই না।

২০০০ সালের কথা। আমি অল্পবিস্তর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তখন দেশের প্রতিটি জেলার আনাচে–কানাচে সন্ত্রাস নির্ভর রাজনীতি ভালোভাবেই জেকে বসেছে। আমার সঙ্গে কেউ কেউ দ্বিমত করতে পারেন। সন্ত্রাসীদের সঙ্গে থানার ওসি, দারোগাদের গলায় গলায় ভাব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের কথায় ওঠেন–বসেন। আমরা যারা শান্তিপ্রিয়, মেধা, সততা, আদর্শ, মুক্তবুদ্ধি চর্চার রাজনৈতিক মতের সমর্থক তারা কার্যত সংগঠনে কোণঠাসা, অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। সন্ত্রাসীরা বিপুল প্রভাব বলয় সৃষ্টি করেছে।

যেকোনো কারণেই হোক (আপাতত কারণটা এখানে নিস্প্রয়োজন), আমি স্থানীয় একটি সন্ত্রাসী চক্রের রোষানলে পড়লাম। আমাকে মৌন সমর্থন করে এমন কিছু সুস্থ রাজনীতির সমর্থকও সন্ত্রাসীদের চক্ষুশূল হলো। তারা নিকটস্থ থানাকে ম্যানেজ করে, ঘটনাই ঘটেনি এমন একটি কাল্পনিক অভিযোগ সাজিয়ে আমাদের কয়েকজনের নামে সেই সময়কার আলোচিত জন নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে। গ্রেফতার এড়াতে, সন্ত্রাসীদের তোপের মুখ থেকে বাচতে তখন পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

মামলাটির মেরিট খুব খারাপ ছিল। আমাদের নির্ঘাত সাজা হবে। মামলার কারণে এমন এক পরিস্থিতিতে পড়ে গেলাম, স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যাহত হলো। মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারছি না।

সব সময় স্বপ্ন দেখতাম ক্যারিয়ার গড়ার, প্রতিষ্ঠা পাবো। সফলতা হাতের মুঠোয় ধরা দেবে। মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজনদের জন্য কিছু করবো।

জীবনের একটি চরম মুহূর্তে এসে গভীর সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেলাম। সব কিছু ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল পরবর্তী জীবনটা অভিশপ্ত অন্ধকার কারাগারে কাটাতে হবে।

আশাহত হলাম না। জীবনটা ধ্বংস হওয়ার আগে পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি! প্রথমে পুলিশ, একে একে শীর্ষ নেতা, জেলা প্রশাসনের কর্মচারীদের কাছে ধরনা দিতে থাকি।

না, লাভ হচ্ছে না, তারা কোনো ভূমিকা রাখতে পারলো না। সন্ত্রাসীদের কাছে সবাই জিম্মি। তাদের প্রচণ্ড প্রভাব–প্রতিপত্তি।

নেতারা হিসাব কষলো। কারা গুরুত্বপূর্ণ? পেশিশক্তি, প্রভাববলয়, নাকি মেধা ও সততা। সামনে নির্বাচন। এলাকার অবস্থান, সাম্প্রতিক মেরুকরণ, গ্রুপ মেরুকরণ, পুলিশের মানদণ্ড আর্থিক লাভের। কারা দিতে পারবে মোটা অংক। প্রকৃত সত্য বিবেচ্য বিষয় নয়।

আমি হতাশ। কিন্তু হাল ছাড়লাম না। মামলা প্রত্যাহার করতে লোক লাগালাম মন্ত্রণালয়ে। এই একটি মাত্র পথ খোলা আছে সামনে।

ঢাকায় মাসে অন্তত বিশ দিন থাকতে হচ্ছে। প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজ এগিয়ে নিচ্ছি। দিন কাটাচ্ছি খুব গোপনীয়তার সঙ্গে। সতর্কভাবে চলাফেরা করতে হচ্ছে। মনের ভেতর ভয় ও অস্থিরতা কাজ করছে। দুই কারণে সাবধান থাকতে হচ্ছে। *এক.* সন্ত্রাসীদের আকস্মিক আক্রমণের, *দুই.* গ্রেফতার এড়াতে পুলিশের ভয়।

যাক, আসল কথায় আসি। এক পর্যায়ে মিনিস্ট্রি থেকে আমাদের মামলা প্রত্যাহার হলো। সব কাজ ঠিকঠাক মতো হলে আদালত থেকে মামলা প্রত্যাহার হতে বড়জোর এক মাস লাগবে। কিছু অফিশিয়াল প্রক্রিয়া আছে। তবে এই সময়ের ভেতর গ্রেফতার হওয়া চলবে না।

২০০১ সালের মার্চ মাস। আমরা *সুবর্ণ এক্সপ্রেস*–এ চট্টগ্রাম যাচ্ছি। আমার সঙ্গে সহযাত্রী মামলার অপর দুই আসামী বিপ্লব ও মশিউল।

আমরা এসি চেয়ার কোচের টিকেট কিনলাম। এসি কামরায় সচরাচর ভদ্র, উচ্চবিত্ত যাত্রী চলাচল করে। নির্ঝঞ্ঝাট, ভাবনাহীন যাত্রাই ছিল আমাদের কাম্য।

ট্রেন তখন কুমিল্লা অতিক্রম করেছে। আমার পরিচিত এক শুভাকাঙ্ক্ষী আমার মোবাইলে রিং করে জানালো, সুবর্ণ এক্সপ্রেসে আমরা চট্টগ্রাম ফিরছি সংবাদটা সন্ত্রাসী চক্র এবং পুলিশের কাছে চাউর হয়ে গেছে।

খবরটা শোনার পর আমাদের টেনশন শুরু হলো। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বগির ভেতর ঘাম বের হচ্ছে। ট্রেনের টিকেট কেনার অপরাধে নিজেকে ধিক্কার দিলাম। টেনশনে সিটে আর বসতে পারছিলাম না। বার বার বগির ভেতর পায়চারী করছি। পাশের সিটের যাত্রীরা আমাদের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছে। তাদের চোখে কৌতুহল।

সূবর্ণ এক্সপ্রেস কোথাও থামে না। চলে দ্রুতবেগে। মাঝপথে কোথাও নেমে যাবো তারও উপায় নেই।

আমরা বগি থেকে বের হয়ে বাথরুমের পাশে খালি অংশে দাড়ালাম। দাড়িয়ে দাড়িয়ে চট্টগ্রাম ফিরছি। আমাদের সিটগুলো খালি। নিজেদেরকে বিনা টিকেটের যাত্রীর মতো লাগছে।

সূবর্ণ এক্সপ্রেস চট্টগ্রাম ঢুকতে পাহাড়তলী স্টেশন থামে। ভাবলাম ওখানেই নেমে যাবো। অকুস্থলে থানা। পুলিশ সেখানে দাড়িয়ে থাকতে পারে। আবার চট্টগ্রাম স্টেশনও নামতে পারবো না। তাহলে নিশ্চিত গ্রেফতার হতে হবে। সন্ত্রাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার আশংকা তো আছেই। এসব ভাবতে ভাবতে দোটানায় পড়ে গেলাম।

ঠিক করলাম পাহাড়তলী ও চট্টগ্রাম স্টেশনের মাঝামাঝি স্থানে ট্রেন যখন স্পিড স্লো করবে তখন একে একে নেমে পড়বো।

ট্রেন দেওয়ানহাট ওভারবৃজ পার হয়ে পলো গ্রাউন্ডের দিকে ছুটছে। ট্রেন আর স্লো হয় না।

বগির দরজা খুলে আমরা তিনজন সারিবদ্ধভাবে দাড়ালাম। বিপ্লব, মশিউলকে বললাম, চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে হলে সামনের দিকে বাম পা ফেলে দৌড় দিতে হবে।

কদমতলী রেলক্রসিংয়ের আগে ট্রেনের স্পিড সামান্য স্লো করলো।

বিলম্ব না করে বিপ্লব নেমে পড়লো। সে প্রচণ্ড নার্ভাস ছিল। ডান পা আগে ফেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রেনের নিচে চলে গেল।

আমাদের বুকের ভেতর ধড়ফড় করে উঠলো। বিপদ থেকে বাচতে হবে। আগে নিজে তো বাচি, পরে দেখা যাবে।

এবার মশিউল ট্রেনের সিড়িতে পা না রেখেই ওপর থেকে জোড়া পায়ে বাইরে লাফ দিল। মাটিতে পরার সঙ্গে সঙ্গে তিনচারবার শূন্যে ডিগবাজি খেল সে।

এবার পরিকল্পনা মতো বাম পা আগে মাটিতে রেখে সামনের দিকে ঝুকে দৌড় দিলাম। আমার শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলাম। ট্রেন থেকে নেমে খানিকক্ষণ দম নিয়ে মশিউলকে খুজতে থাকি। কয়েকশ গজ পেছনে এসে তাকে আবিষ্কার করলাম।

মশিউল গুরুতর জখম হলো। হাত পায়ের কয়েক স্থানে মাংস উঠে গেছে। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত ঝরছে। এবার দুজন মিলে বিপ্লবকে খুজছি।

রাত পৌনে এগারটা। পুরো এলাকা অন্ধকারে নিমজ্জিত। না, তাকে কোথাও খুজে পেলাম না। আবারও খুজলাম। চিৎকার দিয়ে ডাকছি, তার নাম ধরে। তার বিচ্ছিন্ন হাত, পা, মাথা, রক্ত, কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।

তাকে ঘণ্টা খানেক পর সুপারিপাড়া বাইতুশ শরিফে পাওয়া গেল। তার মাথা, হাত, পিঠে রক্তাক্ত।

আমরা পরম করুণাময়ের কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম। কি বাচাই না বাচলাম!

আরো কিছু সময় পর আমরা চট্টগ্রাম স্টেশন গিয়ে খোজ-খবর নিলাম। পুলিশ, সন্ত্রাসী কেউ স্টেশনে দাড়িয়ে থাকার সত্যতা খুজে পেলাম না। শুধু শুধু সারা পথ টেনশন করলাম। বোকামি করে কি রিস্কই না নিলাম!

বিপদের আশংকা মানুষকে দিশাহারা করে ফেলে। বিপদে যে মাথা ঠাণ্ডা করে চলতে হয়, কথাটি সেই মুহূর্তে ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন ঝুকি নেয়ার চেয়ে সাময়িক বিপদ অনেক ভালো। সাময়িক বিপদে তো মানুষ মরে যায় না। বিপদে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়, মোকাবেলা করতে হয়। সমাধানের পথ একটা বের হবেই। কিন্তু চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিলে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে।

সন্ত্রাসীদের হাত খুব লম্বা। মামলা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া তারা ঠেকিয়ে দিয়েছিল। পরে সমাধান হয়েছে অবশ্য। দেশে এখন র‍্যাব নেমেছে। সন্ত্রাসীরা দলে দলে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

পল্টন, ঢাকা থেকে

রং নাম্বার

– ডা. সুভাষ চন্দ্র সেন

ইনডিয়া গেলেই বিভিন্ন চিত্ত বিনোদনের সঙ্গে ওই *পাতাল ট্রেন* (মেট্রো) ভ্রমণটাও বাদ পড়ে না যতোবারই যাই না কেন।

তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালেও যাওয়া হলো। সেদিন ছিল সোমবার। বিকেলবেলা ঘুরতে বের হলাম। দমদম থেকে *টালিগঞ্জ*-এর টিকেট কাটলাম। যথাসময়ে ট্রেন এসে থামলো। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

সিটে বসে *দেশ* ম্যাগাজিনটার ওপর চোখ বোলাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়লো বন্ধু গৌরাঙ্গের কথা। দেখি ওকে একটা কল করা যায় কি না। মোবাইল বের করে কল করলাম! কি ব্যাপার, কল যায় না কেন? মনেই ছিল না যে আমি তো আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে বসে আছি!

ট্রেন এসে *রবীন্দ্র সরোবর* স্টেশনে থামলো। দেখি মোবাইল বেজে উঠলো। কি ব্যাপার! এখানে তো নেটওয়ার্ক থাকার কথা নয়! দুই দাগ নেটওয়ার্কের চিহ্ন। রিসিভ করলাম।

ওপ্রান্ত থেকে একটি মেয়ে বলছে, এই পরিতোষ, তুই কেমন মানুষ? সেই কতোক্ষণ ধরে বসে আছি চৌরঙ্গী রেস্তোরায়, তোর কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে! সময়ের দাম দিতে জানিস?

অবাক হয়ে বললাম, রং নাম্বার। আমি *পরিতোষ* না।

হঠাৎ লাইন কেটে গেল নেটওয়ার্কের কারণে।

টালিগঞ্জে ট্রেন থামলে নেমে উপরে ওঠে আসি।

দেখি আবারও মোবাইল বেজে উঠলো। রিসিভ করলাম। এবার সে বলার আগে আমি বলা শুরু করলাম, দেখুন, আমি পরিতোষ নই, আপনি মনে হয় ভুল নাম্বারে ডায়াল করেছেন।

আরে রাখুন আপনার রং নাম্বার। আগে বলুন আপনি কে, আপনার কাছেই বা এ নাম্বার গেল কি করে? আমাকে পাগল ভেবেছেন? এক বছর ধরে এই নাম্বারে পরিতোষের সঙ্গে কথা বলে আসছি আর আপনি বলছেন রং নাম্বার।

একটু ইতস্তত করলাম। কারণ ওই মোবাইলটা ছিল বন্ধু গৌরাঙ্গের ছোট ভাই দীপকের। কলকাতা গেলেই কারো না কারো মোবাইল ব্যবহার করে থাকি। এটাও ঠিক সে রকম। মনে মনে ভাবলাম দীপকের কোনো পরিচিত মেয়ে বন্ধু হতে পারে এবং ওই নামটা হয়তো ওর ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করছে।

এবার আলতোভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, প্লিজ, আপনার নামটা বলবেন কি?

বললো, *ঝর্ণা*।

বাহ, বেশ সুন্দর নাম। একেবারে পাহাড়ের কন্যা।

আপনি ঔপন্যাসিক নাকি?

কেন বলছেন?

না মানে, খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারেন তো, তাই।

তাই নাকি? তাহলে একবার আসুন না গল্প করা যাবে, ফোনে তো টাকার শ্রাদ্ধ।

ঠিক আছে, কাল বিকাল চারটায় *পার্ক স্ট্রিটে লুম্বিনী* স্টুডিওতে থাকবো।

চিনবো কি করে?

ওই ফোন। ঠিক আছে রাখি।

ঠিক চারটায় পরদিন ওইখানে উপস্থিত হলাম। সংকেত ছিল শুধু মিসকল দেয়া।

ঠিক দুজনই দুজনকে নিচে ফেললাম, কোনো অসুবিধা হয়নি।

ঝর্ণা বললো, চলুন না যেখানটায় *রং নাম্বার* দিয়ে পরিচয় হলো ওখানে।

মানে *মেট্রো ট্রেনে*?

হ্যা, আপত্তি নেই চলুন।

এবার উঠলাম *এসপ্লানেড* থেকে। ট্রেনের সিটে বসে প্রায় আধা ঘণ্টা আলাপ হলো। বললাম, আগামী পনেরো তারিখ চলে যাবো, অন্ততপক্ষে এ কয়েকদিন তো দেখা হচ্ছেই।

আচ্ছা, এর বেশি দিন কি থাকা যায় না?

হ্যা থাকা যেতো। আমি তো একজন চিকিৎসক, তাই শেডিউল টাইমে পৌছাতে হবে। তবে হ্যা, অসুবিধা নেই। বাংলাদেশে চলে গেলেও চিঠি, ফোনে যোগাযোগ হবে। আচ্ছা, ওই পরিতোষটা কে?

এক গাল হেসে বললো, আমার জেঠাতো ভাই। আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। ওই দিন ওকে এক কলেজ টিচারের কাছে প্রাইভেট পড়ানো ঠিক করে দিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করছিলাম।

বাহ, তাহলে তো ট্রেনের সঙ্গেই ওই রেস্টুরেটকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। কারণ আমাদের পরিচয়ের জন্য ওই রেস্টুরেন্টও কম ভূমিকা পালন করেনি!

ঝর্ণা হেসে হেসে বললো, ভালো উপমা দিতে পারেন।

আমরা স্টেশনে নেমে উপরে উঠে এলাম এবং হালকা নাশতা সেরে যাওয়ার জন্য ওর কাছ থেকে বিদায় চাইলাম।

বললো, কাল দেখা হবে তো?

হ্যা।

ঝর্ণা একটা প্রাইভেট মাধ্যমিক স্কুলে মাস্টারি করে।

পরদিন দেখা হলে বললাম, আগামীকাল চলে যাবো।

ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, যদি এভাবে প্রত্যেক দিন দেখা হতো?

দেখা হলে কি হতো?

না মানে, ঠিক আছে দেখা হচ্ছে না তাতে কি? ফোন করবেন।

পরদিন আসার সময় ঝর্ণার সঙ্গে দেখা হয়নি। এখন মাঝে মধ্যে ওর কথা মনে পড়ে যখন ট্রেন দেখি।

পোমরা, চট্টগ্রাম থেকে

আড়ত ও ছবি

– মিজান

২০০২ সালের জুলাই মাসে ফেনী থেকে আমার আম্মাকে ঢাকায় এনেছি চিকিৎসার জন্য। আসার সময় কমলাপুর ট্রেন স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন ছাড়ার কিছু সময় পরে দেখা যায় ট্রেনলাইনের পাশে অসংখ্য চেপা শুটকির আড়ত। চেপা শুটকির আড়ত আর ময়লা-আবর্জনা পাশাপাশি।

যারা শুটকির প্রতি দুর্বল তারা একবার কমলাপুর ট্রেন স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে দেখে আসতে পারেন। আমার ধারণা শুকটি খাওয়ার মজা মিটে যাবে।

মানুষ খায় এমন কোনো দ্রব্য এভাবে নোংরা, আবর্জনার পাশে থাকতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

খাদ্যসামগ্রী অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকা উচিত নয়। চেপা শুটকির আড়তগুলো সরকারি কর্মকর্তাদের নজরে পড়বে কি?

কিন্তু বিদেশের ছবি অন্য রকম।

দীর্ঘ দিন বিদেশে থেকে ট্রেন চড়েছি। ট্রেন থেকে বাইরে তাকালে মন জুড়িয়ে যায়। বাইরের দৃশ্য ছবির মতো সুন্দর, সাজানো গোছানো। মনে হয় কোনো শিল্পীর আকা ছবি।

আরেচ্ছো, ইটালি থেকে

নকল

– আহমেদ সুজন

চায়নিজ ড্রাইভার গ্রাম গ্রামান্তরের পথ শেষ করে অবশেষে আমাদেরকে নিয়ে হাত ইয়াই শহরের অলিগলি পেরিয়ে রেলওয়ে স্টেশনে এসে বললো, এবার নামুন, আপনাদের গন্তব্য এখানেই। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ট্রেন এসে যাবে।

হাত ইয়াই শহরটা অনেক বড় এবং এখানে থাইল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন প্রচেষ্টায় অনেক নতুন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় এখানকার পারিপার্শিকতা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। শিল্পায়ন ও আধুনিকতার পাশাপাশি অপরাধ জগতেরও বিস্তৃতি ঘটেছে। শুনেছি বাটপাড় ও দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছে, এমনকি প্রাণও দিয়েছে। আমাদেরকে সে রকম অবস্থার শিকার হতে হয় নি বলে আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া আদায় করলাম।

আমার স্ত্রী তো নফল নামাজের নিয়ত করে বসলো। লাগেজ নামিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে ভাবছি, সকাল থেকে কি এক ঝামেলার মধ্যেই দিনটা কাটলো! এখন ট্রেন আসা এবং তাতে না ওঠা পর্যন্ত অনিশ্চয়তা কাটবে না। তবে বিদেশে ট্রেন ফেল করে ট্যাকসিতে ক্রস কান্ট্রি শেষে একাই ট্রেনে ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলি ভারী হলো।

পুডুরায়া ও গাবতলীর পার্থক্য নিয়ে কাউকে প্রশ্ন করলে অন্তত অনেক বাংলাদেশি বলবে গাবতলী একটা জঘন্য জায়গা আর পুডুরায়া হচ্ছে কুয়ালা লামপুর শহরের একটি সুন্দর পরিপাটি বাস স্টেশন। তবে দুই জায়গার বাস কিংবা কর্মচারীদের চরিত্র যে এক তা হাড়ে হাড়ে টের পাবার অভিজ্ঞতাই আজকের এই লেখার উপাদান।

সকালে উঠেই আমার আত্মীয়রা আমাকে পুডুরায়া বাস স্টেশনে বিদায় জানাতে এলো। সারি সারি বাসের কাউন্টার এবং গাবতলীর মতোই যাত্রী নিয়ে টানাটানি। নিজের বিবেচনায় এবং বাসের শ্রী দেখে মোটামুটি আশ্বস্ত হয়ে টিকেট কাটলাম। বাস ছাড়ার কথা সকাল সাড়ে আটটায়।

আত্মীয়স্বজনদেরকে আর অপেক্ষায় না রেখে চলে যেতে বললাম।

হায়! সাড়ে আটটা বেজে গেল। গাড়ি ছাড়ার কোনো লক্ষণ নেই। টেনশন বাড়তে লাগলো। এ বাস ঠিক সময়ে বাটারওয়ার্থ (পেনাং) না পৌছালে আমরা ট্রেন মিস করবো। এ কথা বার বার বোঝাতে লাগলাম। কিন্তু বাস স্টাফগুলো যাবো–যাচ্ছি করে সময় পার করে দিচ্ছে। কাকে কি বলবো বুঝে উঠতে পারছি না।

কিছুক্ষণ পর ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটি নেমে গেল। এই লোকটিই এতোক্ষণ বাস স্টার্ট দিয়ে দুই কদম আগায় তো তিন কদম পেছায় ভাব করছিল। যাত্রীরা আশ্বস্ত হচ্ছিল এই বুঝি বাস ছাড়লো।

প্রায় সোয়া নয়টার দিকে নতুন ড্রাইভার এলো। তাকে গিয়ে বোঝালাম আমাদের উৎকণ্ঠার কথা। আমরা ট্রেন ফেল করলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করে পরদিন যাত্রা করতে হবে। এই চব্বিশ ঘণ্টা হোটেলে থাকা খাওয়ার বাড়তি খরচের সঙ্গে ট্রেনের টিকেটের দাম গচ্ছা তো যাবেই, পেনাং থেকে ব্যাংকক পৌছাতে দেরি হলে আবার ঢাকা ফিরতে ঝামেলা হতে পারে।

আমাদের কারো কথা না শুনে যাত্রার নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর বাসটি পুডুরায়া ছাড়লো।

মনটা খারাপ হলো। অনিশ্চয়তার মাঝে মনে হলো হাউ মাউ করে যদি কান্না করতে পারতাম তাহলে বোধহয় মনটা হালকা হতো। একমাত্র সঙ্গী আমার স্ত্রী অসম্ভবভাবে শান্ত থেকে আমাকে সান্ত্বনা দিতে থাকলো এবং সম্ভাব্য করণীয় কি আছে, তাহড়াতে লাগলো। দেশে কোনো বিপদ হলে বিপদ প্লাস বিপদ কেন হলোর জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে অভ্যস্ত স্ত্রীর এরূপ বিজ্ঞ ভাব এ সময়ের অস্বাভাবিক লাগছিল। বাটারওয়ার্থ–এ এসে দেখি পনেরো মিনিট আগে ট্রেন ছেড়ে গেছে।

চব্বিশ ঘণ্টা পেনাংয়ে অপেক্ষা করে পরদিন আবার ট্রেন ধরতে হবে জানা সত্ত্বেও ট্রেনের টিকেট কাউন্টারে গিয়ে অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ করলাম।

সেখানে একজন ভদ্রলোক বললেন, ডাউনটাউনে গিয়ে হোটেলে রাত কাটানো যায় অথবা ট্যাকসি করে থাইল্যান্ডে ঢুকে মিস করা ট্রেন আবার ধরা যায়।

নানান শংকা মাথায় নিয়ে হিসাব নিকাশ করতে শুরু করলাম, কোনটা লাভ হবে!

এক. আমরা কুয়ালা লামপুর ফেরত যেতে পারি যাতে নিরাপত্তা ও থাকা খাওয়ার সাশ্রয় হবে।

দুই. পেনাংয়ে থেকে যেতে পারি। সুসজ্জিত আধুনিক দ্বীপ শহর পেনাংয়ের কোমতার টাওয়ার আর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য হাতছানি দিচ্ছে।

তিন. ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে হোটেলে গিয়ে লম্বা ঘুম দিয়ে পয়সা বাচাতে পারি।

চার. ট্যাক্সি ভাড়া করে থাইল্যান্ড-মালয়শিয়া বর্ডার ক্রস করে হাত ইয়াই রেলওয়ে স্টেশনে পৌছে মিস করা ট্রেন ধরতে পারি।

নিজেদেরকে অপরাধী মনে হচ্ছিল অনেকটা রাগি স্যারের হোমওয়ার্ক না করার মতো। কি সিদ্ধান্ত নেবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। পরে মনে হলো ট্যাক্সিতেই থাইল্যান্ডে ঢুকবো। তবে ভয় হচ্ছিল, ট্যাক্সিওয়ালা যদি কোনো অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে আমাদেরকে মেরে সর্বস্ব লুটে নেয় তাহলে কি হবে। আত্মীয়স্বজন কাউকেই কিছু বলে আসিনি।

ট্যাক্সিওয়ালাদের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল।

আমার স্ত্রী চোখ বড় করে কয়েকজন ট্যাক্সিওয়ালাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল।

হঠাৎ মনে হলো মায়শিয়ায় চায়নিজরা বিশ্বস্ত বলে শুনেছি। ওরাই মালয়শিয়ার উন্নতিতে বিরাট অবদান রেখেছে। তাই আমরা একজন চায়নিজ ড্রাইভারের ট্যাক্সিই বেছে নিলাম।

মাঠ-ঘাট, বন-বাদড় পেরিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চললো। সঙ্গে আনা লাঞ্চ বের করে চলতি গাড়িতেই খেয়ে নিলাম। সম্পর্কটা সহজ করার জন্য ড্রাইভারকেও খেতে সাধলাম।

সে সুন্দর ইংরেজিতে বিনয়ের সঙ্গে আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলো।

সম্পর্ক সহজ হলেও ভয় আর কাটছে না। আমার স্ত্রী *আয়াতুল কুরসি* পড়েই যাচ্ছে।

যেকোনো গাড়িতে বসলেই আমার ঘুম এসে যায়। কিন্তু সেদিন ঘুম আসছিল না।

বর্ডারে এসে গেলাম। মালয়শিয়া শেষ। এবার থাইল্যান্ড শুরু।

ড্রাইভার ইমিগ্রেশনের সামনে এসে বললো, তোমাদের পাসপোর্ট এবং দুইশ বাথ (থাই মুদ্রা) আমার হাতে দাও, আমি স্ট্যাম্প মেরে নিয়ে আসছি।

আমাদের ভিসাসহ সব কিছু ঠিক আছে, দুইশ বাথ কেন দেবো? আমি কোনো টাকা দেবো না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে জানালাম। মনে মনে বললাম, বাছাধন, বোকা পেয়েছো? আর কতো খসাবে?

থাইল্যান্ডের পুলিশ ও ইমিগ্রেশন কর্মীরা খুবই দুর্নীতি পরায়ণ বলে শুনেছি। আজ নিজেরাই যে বলির পাঠা হয়ে সে দৃশ্য দেখতে হবে তা ভুলেও কল্পনা করিনি।

পাসপোর্ট নিয়ে যখন কাউন্টারে গেলাম তখন এক স্মার্ট ইমিগ্রেশন পুলিশ অফিসার হাতের ইশারা দিয়ে আরেকটি কাউন্টার দেখালেন।

ওই কাউন্টারে আরেকজন অফিসার বসে আছে।

ওখানে যেতেই তিনি পাসপোর্ট নেড়েচেড়ে বললেন, তোমাদেরকে এন্ট্রি দেয়া যাবে না।

বললাম, আমাদের সব কিছু ঠিক আছে, তারপরও না কেন?

তখন তিনি বললেন, তোমাদেরকে দশ হাজার বাথ নগদ দেখাতে হবে।

বললাম, অতো বাথ নেই। তবে ডলার দেখাতে পারি। ইমিগ্রেশন কর্তা বললেন, ডলার হলে চলবে না, বাথ হতে হবে।

আমিও নাছোড়বান্দা। ঘুস কিছুতেই দেবো না। জিজ্ঞাসা করলাম, মানি চেঞ্জের দোকান কোথায়।

উত্তর এলো, এক কিলোমিটারের কিছু কম দূরত্বেই টাকা ভাঙানো যাবে। এতোদূরে গিয়ে টাকা ভাঙাবে? দুজনের বিশ হাজার বাথ কোথায় খরচ করবো। এতো টাকা সামলাবো কি করে। তাছাড়া টাকা ভাঙিয়ে ইমিগ্রেশন পার হতে সময় চলে গেলে ট্রেন মিস করবো। বিষণ্ন বদনে ড্রাইভারের কাছে গেলাম।

মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে ড্রাইভার বললো, দাও দুইশ বাথ এবং পাসপোর্টগুলো।

তাই দিলাম। মিনিট পাচেকের মধ্যেই ড্রাইভার ফেরত এসে বললো, তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম। ইমিগ্রেশন অফিসের দিকে তাকিয়ে দেখি ইমিগ্রেশন অফিসার পরিতৃপ্তির হাসি হাসছেন।

ট্রেন এসে গেল। আমাদের সিট দুটো খালিই ছিল। মালপত্র সিটের নিচে রাখতে গিয়ে দেখি কে জানি ভারী কোনো লাগেজ রেখে দিয়েছে। আমাদের লাগেজ কোনোভাবে অন্যত্র সামাল দিয়ে বসে পড়লাম।

আমাদের পাশের সিটে নজর পড়তেই দৃষ্টিতে তালা লেগে গেল। দুটি কিশোর-কিশোরী ওই সিটে জড়াজড়ি করে বসে আছে। মাঝে মধ্যে চুমু খাচ্ছে। সুন্দর ফুটফুটে দুটি টিনএজার প্রেমের আবহমান ধারাকেই মনে করিয়ে দিল। ওদের কোনো বিকার নেই কেউ দেখলো কি না, কেউ কিছু মনে করলো কি না। কোনো ব্যাপারই তাদেরকে নিবিড় বন্ধন থেকে নিবৃত্ত করতে পারছে না। ট্রেন চলতে শুরু করলো। ওদের নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসা চলতে থাকলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ব্যাংকক থেকে ট্রেনে করে বাটারওয়ার্থ (পেনাং), কুয়ালা লামপুর হয়ে সিংগাপুর পর্যন্ত যাওয়া যায়। বিলাসবহুল এই রেলওয়ে কোচগুলো জাপান থেকে আমদানি করা। নিখুত, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। রাতে শোয়ার জন্য উপর ও নিচ পদ্ধতির বাংক আছে। সন্ধ্যা হবার আগেই কেয়ারটেকার লন্ড্ থেকে সিল করা পলিথিন থেকে চাদর বের করে বিছিয়ে দেয় ও পর্দা লাগিয়ে দেয়। সন্ধ্যার খাবার শেষে যাদের আড্ডার বিষয়বস্তু থাকে না তারা শুয়ে পড়ে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই কোচগুলোতে বাইশ ঘণ্টার ভ্রমণ শেষে নিজেকে কখনো এরূপ দীর্ঘ ভ্রমণের যাত্রী মনে হবে না এবং ক্লান্তি ছোবে না।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে আসছিল। কেয়ারটেকার সবার বিছানা করে পর্দা লাগিয়ে দিচ্ছিল। যাত্রীরা অন্যত্র সরে গিয়ে কেয়ারটেকারকে তার দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিচ্ছে। কিন্তু সেই কিশোর-কিশোরী যুগলের কোনো নড়াচড়া নেই। একে অপরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কখনো চোখ বুজছে। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটুন, আজকের এ প্রেমিক যুগল কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন দৃশ্য একটুও খারাপ লাগছিল না। ভালোবাসার জন্য এরূপ নিরবচ্ছিন্ন স্থান হিসেবে ট্রেন ভ্রমণকেই বেছে নিয়েছে ওরা।

মনে হলো ট্রেনের যাত্রী, কর্মচারী সবাই আজ ওদের পক্ষ নিয়েছে। বিছানা করতে আসা কর্মচারীটি ওদেরকে ডিস্টার্ব না করেই ওদের বিছানার পর্দা লাগিয়ে দিল।

ধীরে ধীরে রাত নেমে এলো। হলো ভোর। দুপুরের আগে ট্রেন ব্যাংকক পৌছালো। সবার নামার পালা। ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেটে ট্যাক্সি খুজতে যাবো এমন সময় হঠাৎ নজরে এলো সেই কিশোর-কিশোরীর দিকে। ওরা হাটছে। হাতে ভারী কিছু লাগেজ। এতো ভারী যে, বহন করতে কষ্ট হচ্ছিল। দেখে মায়া লাগলো। কিছুক্ষণ পর কিশোরীটি তার লাগেজ মাটিতে ফেলে দিয়ে মরা কুকুর টানার মতো লাগেজটিকে টানতে লাগলো। লাগেজ দেখে চিনতে পারলাম যে, ওগুলো আমাদের সিটের নিচে ছিল।

এ সময় হঠাৎ করে একদল পুলিশ কমান্ডো স্টাইলে দৌড়ে এসে সেই প্রেমিক জুটিকে ঘিরে ফেললো। তাদেরকে এবার *সুজন সখী* বা *ববি* স্টাইলে ঘর পালানো জুটি বলে মনে হলো। পিতা-মাতা বা কেউ হয়তো পুলিশে কমপ্লেইন করেছে।

কিশোর প্রেমের এই পরিণতিতে আমরা সবাই ব্যথিত হলাম। কি হচ্ছে এক নজর দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম। দেখি পুলিশ ওদেরকে গ্রেফতার করেছে এবং লাগেজ খুলে মালামাল তল্লাশি করছে।
মেয়েটি সিগারেট টানছে আর বুকের বোতাম দুটি খোলা। এবার আর ওর মাঝে নিষ্পাপ মুখচ্ছবিটা খুজে পেলাম না।
এক পুলিশ অফিসারকে ব্যাপারটি জিজ্ঞাসা করতে জবাব এলো, এরা পেশাদার চোরাচালানি। কিশোর-কিশোরী প্রেমাভিনয়ে বাটারওয়ার্থ থেকে পুরো রাস্তা সবাইকে ফাকি দিলেও ব্যাংকক পুলিশকে ফাকি দিতে পারেনি।
(পাঠকদের জ্ঞাতার্তে : মালয়শিয়ার রেল ভ্রমণের ওয়েবসাইট - ktmb.com.my)

asujon@gmail.com

বোকা

- মোহাম্মদ বদরুল আলম সোহেল

লোকমুখে কমলাপুর রেলস্টেশনের কতো আকর্ষণীয় বর্ণনা শুনি। কিন্তু কোনোদিন নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আর এই কমলাপুর স্টেশন দেখতে গিয়ে জীবনে চরম বোকামি করেছিলাম। সে জন্য আমার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছিল।
তখন ছিল ২০০৩ সালের হজ মরসুম। আমার ছোট মামা ছিলেন একটি ট্রাভেল এজেন্সির হজ এজেন্ট। প্রতি বছরই তিনি বিশাল কাফেলা নিয়ে হজ করতে যান। মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করার সুবাদে ও মামাকে সাহায্য করার মতো তেমন কেউ না থাকায় মামা আমার ওপর নির্ভরতার সঙ্গে বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করতেন।
মামাসহ সকল হাজিদের বিদায় জানাতে হাজী ক্যাম্পে অবস্থান করছি। পরদিন সকাল বেলা কাফেলার অর্ধেক হাজিদের ফ্লাইট হওয়ার কারণে বাকি অর্ধেক লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাই তাদের ব্যবস্থা করার জন্য এজেন্সি অফিসের সঙ্গে দেনদরবার নিয়ে মামা ব্যস্ত। আমার ওপর পড়লো সমস্ত লোকদের বোঝানো ও তাদের সেবা-যত্নের ভার। এদিকে ফ্লাইট শেডিউলে সমস্যা দেখা দেয়ায় আরো দুই দিন থাকতে হবে এখানে। গায়ে থাকা শাদা পোশাক কিছুটা ময়লা।
ওই দিন দুপুরের খাবারের পর এয়ারপোর্টে স্টেশনে ঘুরে সময় কাটাচ্ছি। ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থাকলেও কমলাপুর পর্যন্ত যাওয়া হয়নি কখনো। ভাবলাম এই সুযোগ। সঙ্গে সঙ্গেই একটা ট্রেন এলো। প্রাথমিক উত্তেজনায় ও সময়ের কারণে টিকেট কেনার কথা গেলাম ভুলে। একটা বগিতে লাফ দিয়ে উঠলাম। কেউ বাধা দিল না। বগিটি ছিল খালি ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত।
ট্রেন চলতে শুরু করলো। হঠাৎ ভেতর থেকে একজন গার্ডের উদয় হলো। আমার ময়লা পোশাক ও টিকিট বিহীন অবস্থার সুযোগে আমার সঙ্গে গার্ড দুর্ব্যবহার শুরু করলো। এবং আমাকে ভয় দেখালো যে, বিনা টিকেটে গাড়ি ভ্রমণের দায়ে আমাকে ছয়শ টাকা জরিমানা দিতে হবে, অন্যথায় কমলাপুর নামার সঙ্গে সঙ্গেই জেলে পাঠানোরও ভয় দেখালো। যেহেতু আমার সঙ্গে এতো টাকা ছিল না, তাই ভয়ে কমলাপুর দেখার শখের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছিলাম।
সিদ্ধান্ত নিলাম নেমে যাবো। ট্রেনটি তখন যথেষ্ট গতিপ্রাপ্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। স্টেশনের অদূরবর্তী ক্রসিং গেটটি অতিক্রম করামাত্রই লাফ দিলাম। পাথরে পা পড়ে টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড়িয়ে পড়লাম। আল্লাহ আমার সহায় ছিল হয়তো। তাই অল্পের জন্য চাকার নিচে কাটা পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাই। তবে

হাটু ও হাতে যথেষ্ট ব্যথা পাই। শখের শাদা পোশাক ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। প্রিয় পাঠক, ট্রেনে ওঠার পর মাত্র এক মিনিটেরও কম সময়ে চরম বোকা হয়ে গেলাম।

ক্রসিং গেটে নিয়োজিত গার্ড আমাকে তুলে তার রুমে নিয়ে গেল এবং পুলিশে খবর দেয়ার ভয় দেখাচ্ছিল। তখনই জানলাম ওটা ছিল *সুবর্ণ এক্সপ্রেস*। গার্ড আমাকে কোনো মেডিকাল সেন্টারেও যেতে দিচ্ছিল না। বুঝলাম ব্যাটার মতলব খারাপ। এমন সময় আমাদের সঙ্গে হাজি ক্যাম্পে আসা একজন লোক সামনে দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে এনে মামাকে খবর দিতে বলি।

আমার এক্সিডেন্টের খবর পেয়ে পাগলের মতো ছুটে আসেন মামাসহ কাফেলার সবাই। ততোক্ষণে পুলিশে খবর দিতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে গার্ড। এক সঙ্গে এতো লোক দেখে গার্ডও নমনীয় হলো।

পুলিশ এলে ঝামেলা করতে পারে। তাই গার্ডকে কিছু টাকা দিয়ে আমাকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন মামা। তারপর বিকেলের মহানগর ট্রেনে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

এ ঘটনা মনে হলে আজও শিউরে উঠি। প্রিয় পাঠকদের তাই বলি,

এক. কখনোই বিনা টিকেটে গাড়ি ভ্রমণ করবেন না।

দুই. কখনোই চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা করবেন না।

নবুরিয়া, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ থেকে
badrul_1028593@yahoo.com

সরল

– ইংলিশ রিপন

ছোটবেলা থেকেই রেলগাড়ির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। চাষাড়া থেকে আদমজী পর্যন্ত রেললাইনের কিছু দূরেই আমাদের বাড়ি। রেলগাড়ির ঝিকঝিক শব্দে আমার ঘুম আসতো। আবার সেই শব্দের মাঝেই ঘুমাতাম। তাই ছোটবেলাতেই রেল ভ্রমণের স্বপ্ন জাগতো।

প্রথম জীবনের রেল ভ্রমণটা আমার জন্য সুখকর হয়নি। জীবনের প্রথম রেল ভ্রমণে কমলাপুর রেলস্টেশনে হঠাৎ লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে জীবনটাই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। অল্পের জন্য সে যাত্রায় বেচে গিয়েছিলাম।

১৯৯৮ সালে একদিন চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রেলগাড়িতে যাত্রা করি। রোজার ঈদের পরে হওয়ায় যাত্রী তেমন একটা ছিল না। আমি রেলগাড়ির এক বগিতে জানালার পাশে বসেছি। হঠাৎ করেই আমার পাশে এসে এক মধ্যবসয়ী মহিলা গা ঘেষে বসলো। প্রথমে অস্বস্তি বোধ করলেও পরে নারীর সঙ্গে একত্রে ভ্রমণ এই ভাবনায় মনটা পুলিকিত হয়ে উঠলো।

মহিলা দেখতে সুন্দরী না হলেও আকর্ষণীয়। মহিলা এসেই আমার সঙ্গে বসে আলাপ জুড়ে দিল। আমার নাম, কি করি, কোথায় যাচ্ছি ইত্যাদি।

আমিও তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম।

সে তার নাম রুবিনা, বাড়ি কুষ্টিয়া বললো। তার স্বামী বিদেশে আছে।

চট্টগ্রামে কি জন্য যাত্রা জিজ্ঞাসা করতেই কিছুটা নীরব থেকে উত্তর দিল, এমনিই বেড়াতে যাচ্ছি।

আমি আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়লা।

রুবিনা নামের সেই মহিলা হঠাৎ আমাকে জাগিয়ে তুলে বললো, আমি জানালার কাছে বসতে চাই।

বিনা বাক্যে উঠে তাকে আমার আসন ছেড়ে দিলাম। ওঠার সময় তার বিশাল স্তনের সঙ্গে আমার পিঠের ধাক্কা লাগে। তার দিকে তাকাতেই সে মুচকি হাসি দিয়ে বসলো।

মনে মনে ভাবলাম, সে এ কাজটা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছে।

একটু পর সে নগ্ন পা দিয়ে আমার পা ঘষতে লাগলো।
আবার ঘুমের ভান করে বসে রইলাম।
কিছুক্ষণ পর সে আমার জিপারের ওপর হাত রাখলো।
আগে থেকেই আমার ছোট শরীরটা উত্তেজনায় কাপছিল। এবার তার তার স্পর্শে আমার পুরো শরীরটাই উত্তেজনায় দুলে উঠলো। এক হাত দিয়ে তার স্তন দুটি টিপতে লাগলাম।
সে এবার তার মুখটা আমার মুখের সামনে নিয়ে আসতেই তার ঠোট দুটি মুখে নিলাম। চরম উত্তেজনায় যখন আমরা দুজন কাপছি তখনি রেলগাড়ি স্টেশনে আসার হুইসল দিল।
আমরা ঠিকঠাক মতো বসে রইলাম।
নামার জন্য উঠে দাড়াতেই সে বললো, আপনি কোথায় যাবেন?
হোটেলে থাকার কথা জানাতেই সেও আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলো।
দুজনে রেলস্টেশনের কাছেই এক হোটেলে উঠলাম। রুমে ঢোকার পরই শুরু হলো আমাদের মাঝে ঝড়।
এই প্রথম কোনো মধ্যবয়সী নারীর নগ্ন দেহ দেখলাম। অপূর্ব দেহবল্লবীর অধিকারিণী সেই নারী সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আমাকেও নগ্ন করলো। তারপর সে আমাকে চরম সুখের সাগরে ভাসিয়ে দিল।
আমরা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হলাম।
ক্লান্ত দেহে গভীর ঘুমের পর যখন উঠলাম, দেখি আমার সেই রমণী নেই। সঙ্গে আমার ব্যাগ, টাকা, পয়সা কিছুই নেই। কিছু দূরে টেবিলের ওপর একটি চিরকুট পেলাম। তাতে লেখা ছিল এ রকম –

প্রিয়,
আপনার সঙ্গে পরিচয়টা ভালোই উপভোগ করলাম। আপনি ভীষণ সরল। এ রকম সরলদের ঠকতে হয়। আমিও আপনাকে ঠকালাম। তবে সাময়িক আনন্দ দিয়ে। আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার বালিশের নিচে কিছু টাকা রেখে গেলাম যা আপনার উপকারে আসবে।
ইতি –
রুবিনা

খানপুর, নারায়ণগঞ্জ থেকে

ধন্যবাদ আজমির এক্সপ্রেস

– রতন খান

আজ থেকে বছর ছয় আগে দিল্লি গিয়েছিলাম অফিশিয়াল এক ট্রেনিংয়ে। পনেরো দিন ট্রেনিং শেষে ঠিক করলাম আজমির শরিফ যাবো। রাজি হয়ে গেল আরো পাচজন সহকর্মী। আমরা তিনজন নারী, তিনজন পুরুষ।
যথাসময়ে রাতের ট্রেনে দিল্লি থেকে আজমির।
ঢাকা থেকে দিল্লি গিয়েছিলাম প্লেনে। তাই ইনডিয়ার ট্রেনের অভিজ্ঞতা ছিল না। রাত নয়টার ট্রেন। ট্যাক্সি নিয়ে যথাসময়ে স্টেশনে উপস্থিত। আজমিরে যাওয়ার ট্রেন দাড়িয়ে। প্রতিটি বগির গেটে আসন নাম্বার, নাম, পাসপোর্ট নাম্বারসহ তালিকা ঝুলছে। যথাস্থানে গিয়ে দেখি আমাদের চারজনের এক লেনে, অন্য দুজনের অন্য লেনে সিট। একেকটি লেনে ছয়টি বাংক (শোয়ার ব্যবস্থা) চারজনের লেনে আমার বাংক। নিচের পাশে দুটি বাংকে দুই ইনডিয়ান, দোতালা বাংকে আমার সিট। আমার বাংকের ঠিক উপরে আমার নারী সহকর্মীর বাংক। পাশের বাংকের দোতলায় নারী সহকর্মী এবং তিন তলায় পুরুষ সহকর্মী।

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়লো। আশপাশে দেখলাম সবাই প্রায় কাপড় পরিবর্তন করে রাতের কাপড় পরছেন এবং বিছানা, চাদর, বালিশ বিছিয়ে রীতিমতো শোবার আয়োজন করছেন। মনে হলো সমস্ত ট্রেনের মধ্যে আমাদের ছয়জনের এমন তাড়া নেই, ব্যবস্থাও নেই। সঙ্গে শুধু দুই তিনটি আয়রন করা কাপড়।

আমাদের শোয়ার প্রস্তুতি না দেখে নিচের ইনডিয়ান দম্পতিই প্রথম কথা বললেন, বিছানা পাতুন, লাইট অফ করে দেবো (বাংলাতে নয়, প্রথমে হিন্দি – পরে ইংরেজিতে)।

পরে তাকে বোঝালাম, বাংকে পরার মতো আমাদের সঙ্গে কিছু নেই, হাতের ব্যাগ মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়বো।

উপদেশ দিলেন, দীর্ঘ রেল জার্নিতে বিছানা, চাদর, বালিশ আনতে হয়।

আমরা বললাম, আমাদের দীর্ঘ রেল জার্নির অভ্যাস নেই, প্রয়োজনও হয় না।

শিক্ষক দম্পতি যখন জানলেন, আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আজমির যাবো তখন গল্প জুড়ে দিলেন। কবে দিল্লি এসেছি, কোথায় বেড়িয়েছি, কোথায় যাবো ইত্যাদি।

এক মুহূর্তে তারা তাদের ব্যাগ থেকে দুটি চাদর এবং দুটি পাশবালিশ আমাদের দুজনকে দিলেন। শুধু দিলেন বললে ভুল হবে। আমার মায়ের মতো করে চাদরটি বিছিয়ে বালিশ পেতে দিলেন। ভিন দেশে ট্রেনের মধ্যে এমন মায়ের ছোয়া পাবো কল্পনাও করিনি।

কাক ডাকা সকালে আমাদের ঘুম থেকে ডেকে দিলেন। বললেন, বাথরুম সেরে এসো, পরে ভিড় হয়ে যাবে। টুথপেস্ট নিতে যেন ভুলে না যাই তাও মনে করে দিলেন।

কি যেন এক স্টেশনে ট্রেন থামলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম ভদ্রলোক মাটির ভাড়ে করে আমাদের জন্য চা নিয়ে হাজির।

ভদ্রমহিলা ব্যাগ থেকে বিস্কিট বের করলেন।

একের পর এক ঘটনা যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। স্বপ্ন, না বাস্তব! দীর্ঘ দিন পর যেন বাবা–মায়ের স্নেহ, ভালোবাসা পেলাম।

আজমির স্টেশনে নেমে যাওয়ার আগে তারা আমাদের বাবার (খাজাবাবার) মাজার জিয়ারতের পর অনতিদূরে মন্দিরের শহর *পুস্কর* দেখার পরামর্শ দিলেন। কিভাবে চললে এবং কি কি করলে দালালের খপ্পরে পড়বো না তা জানিয়ে দিলেন।

পুস্কর না গেলে অনেক কিছু অদেখা থেকে যেতো।

তাদের পরামর্শে পরবর্তীকালে ইনডিয়ার অনেক স্থানে ঘুরেছি। কোনো বিপদে পড়িনি। বিদেশের মাটিতে এমন গার্ডিয়ান পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার! ধন্যবাদ *আজমির এক্সপ্রেস*। শ্রদ্ধা জানাই আজমির–এর সেই শিক্ষক দম্পতিকে।

সেউজগাড়ী, গণমঙ্গল, বগুড়া থেকে

তারিখ বিভ্রাট ও চোরের বুদ্ধি

– রূপল দাস

এক.

২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। আমরা তিন বন্ধু ব্যক্তিগতভাবে পিকনিক করার সিদ্ধান্ত নিলাম। স্পট নির্ধারিত হলো কক্সবাজার এবং যাত্রার তারিখ নির্ধারিত হলো ডিসেম্বরের ১২ তারিখ। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম কুমিল্লা থেকে ট্রেনযোগে চট্টগ্রাম যাবো এবং চট্টগ্রাম থেকে বাসযোগে কক্সবাজার পৌছাবো।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্রেনের আগাম টিকেট কাটার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে পড়লো। রেলস্টেশনে খোজ নিয়ে জানলাম, চট্টগ্রামগামী *আন্তনগর তূর্ণা নিশিথা* কুমিল্লা স্টেশন থেকে রাত দুইটা আঠারো মিনিটে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

অন্য দুই বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে এ ট্রেনেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। দায়িত্ব অনুযায়ী আমি ৮ ডিসেম্বর স্টেশনে গিয়ে ১২ ডিসেম্বরের তিনটি টিকেট কিনে আনলাম।

১২ ডিসেম্বর আমরা তিন বন্ধু রাত দুইটার আগেই স্টেশনে পৌছে গেলাম। স্টেশনে পৌছার পর ট্রেনের জন্য অপেক্ষার সময় যেন কাটছিল না।

যথাসময়ে ট্রেন এলো না। প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ ট্রেন কুমিল্লা স্টেশনে এসে থামলো। ট্রেনে আমাদের নির্ধারিত বগিতে উঠে আমাদের সিট নাম্বার খুজে বের করতেই দেখলাম, আমাদের সিটে অন্য লোক বসে গেল।

আমাদের নির্ধারিত সিট নাম্বারের সিটে বসা লোকদের সিট ছেড়ে দিতে বলতেই তারা কারণ জিজ্ঞাসা করলো।

আমাদের টিকেট দেখিয়ে বললাম, টিকেট আছে, তাই।

আমাদের অবাক করে দিয়ে তারাও টিকেট দেখিয়ে বললো, তাদেরও টিকেট আছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমাদের কি করা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ঠিক ওই মুহূর্তে ট্রেনের এক যাত্রী এগিয়ে এসে আমাদের টিকেটগুলো দেখতে চাইলো।

টিকেট দেখতেই তিনি বললেন, ভাই, আপনাদের টিকেটগুলো গতকালের টিকেট।

এবার টিকেট হাতে নিয়ে দেখে লোকটিকে বললাম, ভাই, আপনার কি মাথা খারাপ? এই তো টিকেটে যাত্রার তারিখ লেখা আছে ১২ তারিখ।

লোকটি বললো, ভাই, এখন রাত প্রায় সাড়ে তিনটা বাজে। ট্রেনের নিয়ম অনুযায়ী রাত বারোটার পর যেসব ট্রেনের যাত্রার সময় থাকে সেগুলোকে পরবর্তী তারিখের ট্রেন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সে অনুযায়ী এ ট্রেনটি হচ্ছে ১৩ তারিখের।

লোকটির কথায় পাশের অন্য যাত্রীরাও সায় দিল।

কি আর করা! এ ঘটনার জন্য আমাদের অনভিজ্ঞতাকে দায়ী করলাম। অনভিজ্ঞতার কারণে টিকেট কেটেও ট্রেনের অবৈধ যাত্রী হয়ে গেলাম। পরে ট্রেনের সবগুলো বগি ঘুরে কোথাও একটি খালি সিট পেলাম না।

অগত্যা কি আর করা! সারা রাত ট্রেনে দাড়িয়ে কষ্টকর ও বিরক্তিকর এক ট্রেন ভ্রমণ করে পিকনিকের আমেজের বারোটা বাজিয়েই চট্টগ্রাম পৌছালাম।

দুই.

কুমিল্লা থেকে মেইল ট্রেনে করে আখাউড়া যাচ্ছিলাম। কুমিল্লা স্টেশন থেকে দুই স্টেশন পরের একট স্টেশনে আমাদের ট্রেনটি থামতেই আমি যে বগিতে ছিলাম ওই বগিতে কয়েকজন মহিলা কয়েক বস্তা ইনডিয়ান চোরাই চিনি নিয়ে উঠলো। মহিলাদের কেউ চিনির বস্তাগুলোকে সিটের নিচে রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল, কেউ বা মেঝেতে কাপড় বিছিয়ে চিনিগুলো বস্তা থেকে কাপড়ে ঢেলে রাখলো। আবার কিছু মহিলাকে দেখলাম তাদের পরনের কাপড়ের উপরের অংশ খুলে ওই অংশের সঙ্গে তাদের চিনির বস্তাটিকে পেচিয়ে বেধে রাখলো।

অনেক চিন্তা করেও মহিলাদের এসব ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বনের কারণ খুজে পেলাম না।

পরে ট্রেনটি কসবা স্টেশনে থামতে না থামতেই ট্রেনের মধ্যে কয়েকজন বিডিআর সদস্য উঠলো এবং বিভিন্ন সিটের নিচে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা চোরাই চিনির বস্তাগুলো ট্রেন থেকে নামিয়ে নিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিলাদের ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বনের কারণ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। মেঝেতে কাপড় বিছিয়ে ঢেলে রাখা চিনিগুলো বিডিআর সদস্যদের নামাতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু যেসব মহিলাগুলো পরনের কাপড়ের সঙ্গে চিনির বস্তাকে পেচিয়ে বেধে রেখেছিল তাদের বস্তাগুলো বিডিআর সদস্যদের পক্ষে নামানো সম্ভব হলো না শেষ পর্যন্ত।

কারণ বিডিআর সদস্যরা কাপড় পেচানো বস্তাগুলো নামানোর জন্য টান দিলেই মহিলাদের পরনের নিম্নাংশের কাপড় খুলে যাচ্ছিল।

ওই দিন মহিলাদের বুদ্ধি দেখে খুবই অবাক হয়েছিলাম।

কুমিল্লা থেকে

রিয়াল সারপ্রাইজ

– মোহাম্মদ কবির হোসেন

দরজার খটখট শব্দে ঘুম ভাঙলো আমার। দরজা খুলতেই দেখি সুমি দাড়িয়ে।

কি ব্যাপার সুমি, তুমি এ ভরদুপুরে! তোমাকে এতো সুন্দর লাগছে কেন? শাড়িতে তোমাকে অপরূপ লাগছে।

ছাই লাগছে। সুমি বললো, চলো না দুজন কোথাও বেড়াতে যাই। তোমাকে আজ সারপ্রাইজ দেবো।

আজ তোমার কি হয়েছে সুমি। হঠাৎ করে শাড়ি পড়ে এলে। আবার সারপ্রাইজ! আজ কি তোমার কোনো বিশেষ দিন?

সুমি বললো, চলোই না, তারপর বলবো।

আমি ঝটপট তৈরি হয়ে বললাম, চলো। কোথায় যাবো?

সুমি বললো, রেলস্টেশনে চলো।

রিকশা ডাকলাম।

রেলস্টেশনে পৌছেছি। তখন সন্ধ্যা প্রায়।

শুক্রবার বন্ধের দিন থাকায় ট্রেনে লোক ছিল কম। আমি ও সুমি যে বগিতে উঠলাম সে বগিতে কোনো লোক ছিল না।

সুমি ব্যাগ থেকে লাল মোমবাতি বের করলো। দিয়াশলাই দিয়ে মোমবাতি জ্বালালো। বললো, আজ আমার জন্মদিন।

অবাক হলাম। বললাম, আগে বলবে তো!

সুমি ছোট একটি ফু দিয়ে মোমবাতি নেভালো।

সুমিকে দুহাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম।

সুমি কেক খাও বলে আমার ঠোটে চুমু খেলো।

বললাম, তুমিও একটু খাও। আলতো করে সুমিকে চুমু খেলাম।

এক ঘণ্টা ট্রেনে থাকার পর নেমে পড়লাম। আবার অন্য ট্রেনে উঠে গেলাম যেখান থেকে উঠেছি সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য।

ট্রেনের জানালার পাশে দুজন, বাতাস বইছে, আকাশে তারার মেলা।

সুমি আমাকে বললো, এই যে আমাদের গোপন অভিসার, এটাকে মনে রাখার জন্য তোমাকে আরেকটা সারপ্রাইজ দেবো। তুমি আমাকে আদর করতে পারো।

সুমির আত্মসমর্পণ। তাই আস্তে আস্তে সুমির সারা অঙ্গে বিচরণ করছে আমার ঠোট, হাত।

ট্রেনের ঝাকানিতে সুমি সুড়সুড়ি অনুভব করলো এবং হাসতে হাসতে পাগল প্রায়। সুমি বললো, আজ এ পর্যন্ত সমাপ্ত করো। বিয়ের পর বাসর রাতে না হয় পূর্ণ সারপ্রাইজ নিও।

ট্রেন থামলো।

আমি ও সুমি বাসায় ফিরলাম।

কয়েকদিন সুমির খোজ নেই। কোনোভাবেই সুমির কোনো খবর নিতে পারছি না। সুমি কোথায়?

ডাকপিয়ন মারফতে সুমির বিয়ের কার্ড পাই। যদিও কাছাকাছি আমাদের বাসা। বিয়ের কার্ডের ভেতর সুমির চিঠি। সুমি লিখেছে,

সবার সব ইচ্ছা পূরণ হয় না। তেমনি আমাকে পাওয়ার ইচ্ছাও তোমার পূরণ হলো না। আমি তোমার থেকে কিই বা পাবো। এখন আমার যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সে আমেরিকা থাকে। কয়েকদিন পর আমিও হবো আমেরিকান। তোমাকে ঠকাইনি, বরং তোমাকে বিয়ে করলে আমি ঠকতাম। বিয়েতে আসা না আসা তোমার ব্যাপার। ভালো থেকো।

সত্যিই সুমির চিঠির তুলনা নেই। খুব সুন্দর সুমির বিয়ের কার্ড ও সুমির চিঠি।

সারপ্রাইজের কথা কতো সহজেই সুমি ভুলে গিয়েছিল!

আমার জন্য সেটাই ছিল রিয়াল সারপ্রাইজ।

ভোলা থেকে

প্রসূতি

- মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ

ট্রেন ভ্রমণের সঙ্গে আবাল্য পরিচিত থাকলেও ট্রেনের সঙ্গে এমন সব বিষয় সংশ্লিষ্ট আছে যা ছিল আমার জানার বাইরে। এসবের সঙ্গে জ্ঞাত হতাম না যদি বাবার চাকরি সূত্রে বদলি হয়ে শ্যামগঞ্জ না আসা হতো। এখানকার ট্রেন যোগাযোগে কয়লার ইঞ্জিন ছিল নেত্রকোনা, উত্তর ময়মনসিংহের মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যাপার-স্যাপার। ওটার সর্বশেষটি এসে দেখেছিলাম। আস্তে আস্তে ট্রেন, স্টেশনের কর্মচারীদের নানান কিসিমের শব্দ সংযোজন কৌতূহল জাগালো।

লাল রঙয়ের ট্রেনের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের পরিচয় নেই। কিন্তু এক সময় এই লাল ট্রেনের ক্লান্তিহীন ছুটে চলা এক ধরনের ঐতিহ্য ছিল যা এলাকার মানুষের কৃষ্টি, সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে।

ট্রেনের রঙ লাল থেকে যেদিন প্রথম সবুজ করা হলো তখন আমরা কলেজ ছাত্র। প্রতিদিন সূর্যোদয়কে সঙ্গে করে স্টেশনে ছুটি। সন্ধ্যার পর ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ একটা দেহ নিয়ে স্টেশনে ফিরে বাড়ির পথ ধরি।

এরই মাঝে নিজামভাইয়ের বিয়ের বরযাত্রী, শিক্ষা সফর, ঢাকায় সম্মেলন, বাথরুম জটিলতায় আক্রান্ত হওয়া, ব্লক চেকিংয়ে পড়ে শাস্তিভোগ করা, নিয়মিত আট দশজন যাত্রীর সঙ্গে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ভাগাভাগি করা, অসুস্থ বাবাকে নিয়ে যাওয়া, রাত দুটোয় স্টেশনে বসে ঘুমানো, কেবল ইঞ্জিনে চড়ে বাড়ি ফেরা, ছাদে বসে বৃষ্টিতে ভেজা... সবই স্মৃতির আসর।

নিয়মিত কলেজ স্টুডেন্ট যারা ট্রেনে ময়মনসিংহ যেতাম তাদের মধ্যে নুরুল আমীনভাই, আনুআপা সফল হলেন। কারণ নুরুল আমীনভাই বাংলায় মাস্টার্স ক্লাস করতে যেতেন, সঙ্গে যেতেন তারই প্রিয়তমা। পরবর্তীকালে দুজন বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

আনুআপার সঙ্গে তারচেয়ে বয়সে কম একজন ব্যাংক কর্মকর্তা ট্রেনে সহযাত্রী ছিলেন। এরাও বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

কোনো কোনো বন্ধু এতো ভিড় সহ্য করেও কেবল ট্রেনে চড়তেন অন্ধকারে কিছু নারী দেহের সংস্পর্শে তৃপ্ত হতে...। বিচিত্র হলেও এটাই বাস্তবতা।

সেদিন ট্রেনের দেরি ছিল সাড়ে সাত ঘণ্টা। সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা হরতাল। কেবল সে হরতাল শেষ হয়েছে, লাইট পোস্টের বাতি সবেমাত্র জ্বলেছে। সারা দিন কোলাহলহীন স্টেশনে ফিরে এসেছে চাঞ্চল্য। দাড়ানো ট্রেনের কাছেই একটা জটলা। চারপাশে ভিড় জমে উঠেছে।

জনৈকা মহিলা বললেন, দশ বারো মাইল দূর থেকে আসা মহিলাটির আজ প্রসব সম্ভাবনা। সকালেই বাড়ি ছেড়ে এসেছে, সঙ্গে দুটো যুবক ছেলে। সারা দিন হরতালে একটা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন তারা।

তক্তা দিয়ে বানানো দোলায় করে রোগিণীকে বহন করে এনেছে যুবকদ্বয়। ক্রামগত প্রসব বেদনা বেড়ে চলেছে। সন্ধ্যায় হরতাল শেষ হলো। ট্রেনের ইঞ্জিন শব্দ করে ধোয়া উদগীরণ শুরু করে। হকারদের ছোটাছুটি শুরু হয়। টিকেট কাউন্টারের সামনে জমে ওঠে টিকেট কাটার ভিড়। ব্লক ফোনে খবর আসে। ট্রেন ছাড়ার লাইন ক্লিয়ার দেন স্টেশন মাস্টার। যেন তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোগিণীর ব্যথা বাড়ে।

দুই চারজনের সহায়তায় প্রসূতিকে ট্রেনে উঠিয়ে লম্বা একটি সিটকে বেড হিসেবে প্রস্তুত করা হলো। ততোক্ষণে ট্রেন নড়ে উঠেছে। ভেতরে প্রসূতির গোঙ্গানি, বাইরে পশ্চাৎগামী সন্ধ্যার ক্ষেত-খামার, গাছপালা। নিচে রেলের সঙ্গে চাকার শব্দ।

দুজন সহৃদয় গ্রামীণ মহিলা এগিয়ে এলেন। কিছু করারও ছিল না তাদের। ট্রেনের দুই ঘণ্টার এ জার্নি আমাদের জন্য দুর্বিষহ তো বটেই, উপরন্তু প্রসূতির কষ্টের গোঙ্গানিতে ধ্বনিত হচ্ছিল আমাদের দেশে সন্তান প্রসবের সকরুণ অবস্থাটি।

শ্যামগঞ্জ, গৌরীপুর, বিষকা, তারপর শম্ভুগঞ্জ। এখানে এসে যেন পুরো ট্রেনটাই শিথিল কেচোর মতো কুকড়ে যাচ্ছিল। দুবার দম করে করে পুরো দেড় ঘণ্টা লেট। মহিলাদ্বয়ও ময়মনসিংহ যাবেন। ওনাদের ত্বরিত বুদ্ধিতে সেদিনকার জটিল পরিস্থিতি সামলে ওঠা গিয়েছিল।

ওনারা বললেন, ট্রেনের যা অবস্থা, ময়মনসিংহ যাওয়ার আগেই না আবার প্রসূতির সন্তান প্রসব হয়ে যায়!

ওনাদের মুখে শুনলাম প্রসূতির জরায়ু থেকে রক্ত পানি ভাঙছে।

আমাদের মাথায় তখন কিছুই খেলছে না। মহিলাদ্বয় একটু কষ্ট স্বীকার করে প্রসূতিকে ধরাধরি করে রেলস্টেশনে নামিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে নিয়ে গেলেন।

অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে তারা প্রসবের সমুদয় সরঞ্জাম জোগাড় করে সন্তান প্রসব পালাটি সমাপ্ত করলেন।

কিন্তু ট্র্যাজেডি ওইখানেই। সন্তানটি একটা চিৎকার দিয়ে পরক্ষণেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল।

আমাদের চার পাচজনের দলটি স্টেশন মাস্টার, ড্রাইভারের ওপর চড়াও হলাম। কিন্তু ততোক্ষণে ট্রেন ছেড়ে গেল।

স্টেশন মাস্টার বললেন, আসলে আমাদের যেভাবে চলতে বলা হয়, আমরা সেভাবেই চলি। আমরা হুকুমের দাস। ভাগ্য বিড়ম্বনা আমাদের নিত্যসঙ্গী।

শুধু রেল কর্মচারী কেন, ট্রেনযাত্রীরাও এক ধরনের ভাগ্য বিড়ম্বনার পাত্র।

হয়তো এ রকম ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এমন তো অহরহই ঘটছে। তারপরও ট্রেন একটা আলাদা জগতের বৈশিষ্টমণ্ডিত। ট্রেন নিয়ে কবিতা, গল্প, নাটক, সিনেমা, গান, কোনটা বাদ যায়?

স্কুলে পড়ুয়ার *এ জার্নি বাই ট্রেন* মুখস্থ করলেও যতোদিন পর্যন্ত এই ট্রেনের সঙ্গে জীবন পুরোটা ঘনিষ্ঠ না হয় ততোদিন ওই রচনার রসই পাওয়া মুশকিল।

শ্যামগঞ্জ বাজার, ময়মনসিংহ থেকে

পকেটমার

– মোহাম্মদ তোজাম্মেল হক

আমার প্রতিদিন নিয়মিত স্কুলে যাওয়া–আসা ভালো লাগে না। কিভাবে যে পড়ালেখা করা থেকে মুক্তি পাবো সে পথ খুজে পাই না। আমি তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। আমার চাচাতো ভাই আবু বক্কর সিদ্দিক আমার সমবয়সী। সে কোনোদিন স্কুলে যায়নি। তার কাজ শুধু জমি চাষ করা। ছিদ্দিকের প্রতিদিনের কাজ হলো সকালে উঠে হালের গরু দুটোকে গোয়াল ঘর থেকে বের করে ভালোভাবে খাইয়ে–দাইয়ে লাঙ্গল–জোয়াল ঘাড়ে নিয়ে রওনা দিতে হয় জমি চাষের উদ্দেশ্যে।

প্রতিদিন সিদ্দিককে বলতাম, আজ অনেক পড়া মুখস্থ করতে হবে। তা না হলে কাল নিশ্চিত স্যারের পিটুনি। প্রতিদিনই পিটুনি খেয়ে থাকি।

সিদ্দিকেরও একই কথা, আমারও ওসব জমি–টমি আর ভালো লাগে না।

বললাম, চল এক কাম করি।

ও বলে, কি কাম?

চল আমরা দুজনে কোথাও পালিয়ে যাই।

কোথায় যাবো? আমাদের তো কোনো পথ জানা নেই।

তাই বললাম, যেদিকে মন চায় সেদিকেই যাবো।

ও বলে, আমার কাছে তো কোনো টাকা নেই।

টাকা নেই, তাতে কি হয়েছে, বুদ্ধি আছে না! তোদের ঘরের কোণায় দেখিস একটা মুরগি ডিম পাড়ে। সে ডিমগুলো চুরি করতে পারবি?

আরে ও কোনো কামই না। হ্যা, খুব পারমু।

বেলা তখন নয়টা বাজে। আমার ক্লাস শুরু এগারোটায়। কুড়িগ্রামে ট্রেন আসে দুপুর বারোটায়।

সিদ্দিকের মা পাশের বাড়িতে গেছেন, এই সুযোগে দশটি ডিম গামছায় বেধে লুঙ্গির নিচে লুকিয়ে রওনা হয় আমার সঙ্গে।

আমি স্কুলে যাবো বলে মাকে বললাম, মা যাচ্ছি।

মা বললেন, যাও, তবে কারো সঙ্গে মারামারি করো না যেন।

কুড়িগ্রাম বাজারে এসে দশটি ডিম বিক্রি করলাম বিশ টাকায়। ওর পরনে একটা লুঙ্গি আর গায়ে একটা পুরনো শার্ট। যেহেতু আমার পরনে শার্ট–প্যান্ট, সে কারণে ডিম বিক্রির টাকাগুলো আমার কাছে রাখা হলো।

কুড়িগ্রাম জেলায় রেলস্টেশন দুটি। একটিকে বলা হয় নতুন রেলস্টেশন, আরেকটিকে বলা হয় পুরাতন রেলস্টেশন। পুরাতন রেলস্টেশন আমাদের বাড়ির কাছাকাছি। তাই সেখানে গেলাম না। কেননা কোনো চেনা–পরিচিত মানুষ যদি দেখে ফেলে তাহলে আর যাওয়া হবে না।

দুজনই পায়ে হেটে চলতে থাকি নতুন রেলস্টেশনের দিকে। শেষমেশ স্টেশনে গিয়ে পৌছালাম এগারোটায়। দুজনের একজনও কোনোদিন ট্রেনে উঠিনি। তখন আমরা ট্রেনকে ট্রেন বলতাম না, বলতাম রেলগাড়ি।

সিদ্দিক এখনো ট্রেনকে রেলগাড়িই বলে থাকে।

প্ল্যাটফর্মের আশপাশ দিয়ে হাটাহাটি করছি আর রেললাইন দেখছি। হঠাৎ সিদ্দিকের চোখে পড়ে রেললাইনের ফাকে কয়েকটি টাকা পরে আছে।

বললাম, দেখি।

হাতে নিয়ে গুনে দেখি সাতাশ টাকা।

একটু পরেই ট্রেন এলো। ট্রেনে উঠে বসলাম দুজনই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ট্রেন আবার পুরাতন স্টেশনের দিকে রওনা হলো।

কি আর করা! বসেই রইলাম সিটে। এই অবস্থায় ট্রেনে সবগুলো বগির বেশির ভাগই সিট খালি।

ট্রেন পুরাতন রেলস্টেশন হয়ে রওনা হলো উলিপুরের দিকে। উলিপুর থেকে নতুন স্টেশনে ট্রেন ফিরলো দুপুর একটায়। আমরা দুজনের একজনও ট্রেনের টিকেট কাটিনি। কিছুক্ষণ সিটে বসে থাকি আবার কিছুক্ষণ সিটের ওপর বস্তা, ব্যাগ ইত্যাদি রাখার জায়গায় শুয়ে থাকি যাতে চেকার ধরতে না পারে।

নতুন স্টেশন হয়ে এই ট্রেন পার্বতীপুর রেল জাংশন পর্যন্ত যাবে।

আমরা দুজনই ব্যাগ রাখার জায়গায় শুয়ে আছি। রাজারহাট, শিংয়ের ডাবড়ি রেলস্টেশন পার হয়ে তিস্তা, তারপর কাউনিয়া রেলজাংশন। কাউনিয়া এসে কিছুক্ষণের জন্য ইঞ্জিন অদল-বদল। মাঝখানে এ ট্রেনের যাত্রী ও ট্রেনে এবং ও ট্রেনের যাত্রী এ ট্রেনে উঠলো।

আমরা যেখানে শুয়ে আছি তার নিচের সিটে বসলো তিন সুন্দরী যুবতী। আমার মনে হয় তিনজনই রংপুর কারমাইকেলে পড়ে। কেননা তারা তিনজনই কারমাইকেলের আলাপ আলোচনা করছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে নোটবুক।

মেয়ে তিনটি রংপুরে নেমে যায়। আমরা রংপুর পেরিয়ে যাচ্ছি, চেকার একবারও আমাদের চেক করেনি।

বদরগঞ্জ রেলস্টেশনে আসার পর মাইকে শুনতে পাই ট্রেন ছাড়তে এক ঘণ্টা দেরি হবে। কারণ ট্রেনের ইঞ্জিন নাকি বিগড়ে গেছে।

দুজনই নেমে এক কলার দোকানে গেলাম। সারা দিন কিছু খাইনি, অন্যদিকে বাড়ির কাউকে বলেও আসিনি। ক্ষিধেই পেট চো চো করছে। চারটা কলা কিনলাম চার টাকা দিয়ে।

দুজনে কলা চারটি খেয়ে একটু ঘোরাফেরা করে আবার ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন রওনা হলো পার্বতীপুরের দিকে। এখানে ট্রেন পৌছার কথা ছিল রাত এগারোটায়। সে ট্রেন পৌছালো ভোর চারটায়।

ঘন কুয়াশায় ঘেরা সেই ভোরে নামলাম পার্বতীপুরে। চারদিকে তাকাতাকি করছি। সামনে একটি বৃজ দেখা যাচ্ছে। বৃজের কাছে গিয়ে এক রিকশাচালককে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই, দিনাজপুরের গাড়ি ছাড়বে কখন?

রিকশাচালক বললো, আমি কিছু জানি না।

কিছুক্ষণ পরে পাথর সিমেন্ট দিয়ে গড়া একটি বেঞ্চে বসলাম। পাশে এসে বসলো একটি অচেনা ছেলে।

তাকে বললাম, ভাই, আমরা দিনাজপুর যাবো, তো কোন রেলগাড়িতে চড়বো ভাই।

ওই ছেলেটি বলে উঠলো, আমিও তো দিনাজপুর যাবো।

আসলে সে দিনাজপুর যাচ্ছিল না। তার পরিচয় হলো, সে আমাদের পকেট মারবে বলেই পিছু নিয়েছিল এবং তাতে সে সফল হয়েছিল।

ডিম বিক্রির এবং রেললাইনে পাওয়া সেই টাকা সে মেরে দিয়েছিল।

বন্দর, চট্টগ্রাম থেকে

স্বপ্ন দেখার আগে

- অণু

ছয় থেকে নয় বছর বয়সের মধ্যে আমার নিয়মিত ট্রেন ভ্রমণ হয়েছে। শান্তশিষ্ট ছিলাম, তাই হয়তো সকলে খুব আদর করে কথা বলতো।

মনে পড়ে নাম না জানা সেই লোকটিকে যিনি কি না আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে ভুলে গিয়েছিলেন নিজ গন্তব্যস্থলে নামতে। পরে যখন বুঝতে পারলেন তখন চলন্ত ট্রেন থেকেই তিনি নামলেন।

বড় বড় চোখে তার নামা দেখছিলাম।

ঝাপ দিয়েই পড়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাথরের সঙ্গে লেগে কাধের কাছটা কেটে গিয়েছিল। ভদ্রলোক শাদা শার্ট পরেছিলেন।

অপলকে তাকেই দেখছিলাম জানালা থেকে।

তিনি আহত হবার পরও হাসি মুখে উঠে দাড়িয়ে আমাকে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন।

এখনো দৃশ্যটি চোখে ভাসে।

রাতের বেলা চলন্ত ট্রেন থেকে দূরের গ্রামে জ্বলতে থাকা আলোগুলোকে মনে হতো ছুটে যাওয়া আলোর গোলক। কচি মনে ভয়ের ঢেউ খেলতো। স্টেশনে যখন ট্রেন থামতো তখন মনে হতো পুরো স্টেশনের সব মানুষ একই লয়ে চলছে। যাত্রী উঠছে, নামছে, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, বাদাম বিক্রেতা, ফেরিওয়ালা, ট্রেন ছাড়ার টিং টিং শব্দ, এসব কিছু মিলিয়ে মনে হয় যেন একটি কনসার্ট। কারো সঙ্গে কারো সংযোগ নেই, অথচ একটি ছাড়া তা যেন অসম্পূর্ণ।

একবারের ঘটনা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। অজান্তেই শিউরে উঠি। দিনাজপুর থেকে রাজশাহী আসছি। হরিয়ানে এসে ট্রেন থেমে গেল। রাজশাহী স্টেশনে মারামারি হয়েছে। তাই ট্রেন আর যাবে না। আম্মা ও আট বছরের এই আমি। সঙ্গে সুটকেস, দুই বস্তা ভর্তি দিনাজপুরের বিখ্যাত চাল।

আম্মা তো মুশকিলে পড়লেন।

ট্রেনে আলাপ হওয়া এক কাকু আমাকে কোলে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে রেখে গেলেন আর ভয় না পাওয়ার কথা বলে আবার বগিতে উঠলেন।

উল্লেখ্য, প্ল্যাটফর্ম থেকে আমাদের বগির দূরত্ব অনেকখানি ছিল। হঠাৎ দেখি ট্রেন চলতে শুরু করেছে। ভয়ে কান্না শুরু করলাম। আম্মা তো বগিতেই আছেন।

অন্যেরা সান্ত্বনা দিচ্ছে এবং বলছে, ট্রেন যাবে না, তুমি কেদো না।

ছোট্ট মন কি দিয়ে বাধ মানে!

এদিকে কুলিরা তাদের শ্রম কমানোর উদ্দেশ্যে আমাদের জিনিসপত্রগুলো তাড়াহুড়ো করে প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিল। ট্রেন তো চলছেই।

হঠাৎ দেখি এক মহিলা ট্রেন থেকে ঝাপ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

আমিও কান্না ভুলে সেদিকেই দেখছি।

মহিলাটি লাফিয়ে পড়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

ধীরে ধীরে যখন এগিয়ে এলো তখন দেখলাম সে আমারই মা।

সুটকেসে টাকা ছিল। তাই আম্মা ভয় পাচ্ছিলেন কেউ যদি নিয়ে পালায়! আমার খুব কষ্ট লাগছিল। যদি...। দুই হাত, দুই হাটুর চামড়া ছিলে গিয়েছিল। এ দেশে পাপ করে কারা আর তার ফল ভোগ করেই বা কে?

গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর ভোরে ট্রেন। তাই অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে রাজশাহী স্টেশনে এলাম। সঙ্গে দুই ভাগ্নে ও আম্মা। ট্রেনে উঠতে গিয়েই হলো বিপত্তি। মূল লাইন ডিঙিয়ে ট্রেনে উঠতে হবে। কিন্তু পা দেবো কোথায়! সদ্য ঘুম থেকে ওঠা চোখে জায়গায় বা দেখছি কি! বিভিন্ন পরিমাণের এবং রঙের সমাহারে মনুষ্য বিষ্ঠা। আর কি-ই বা তার গন্ধ! একটির ওপর দেখলাম স্যান্ডালের মাপ বসে গেছে।

কোনো মতে উঠলাম বগিতে। কিন্তু মনে হচ্ছিল এক্ষুণি ছুটে গিয়ে গোসল করি। ট্রেন ভ্রমণ আরামদায়ক হলেও এর টয়লেট নিয়ে রয়েছে নানান সমস্যা। *প্রথমত.* নোংরা, অপরিষ্কার। *দ্বিতীয়.* পানি পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ত. দরজার হুক থাকে নষ্ট। সর্বোপরি সবচেয়ে জঘন্য লাগে মলমূত্রগুলো লাইনের মাঝখান দিয়ে পড়তে পড়তে যায়। এতে করে পরিবেশ হয় দূষিত। অরুচির পরিচায়ক তো বটেই।

সিনেমা, নাটকে নায়ক নায়িকার হাত ধরাধরি করে লাইনের ওপর দিয়ে হেটে বেড়ানোর দৃশ্য বড়ই ভালো লাগে। কিন্তু যখনই মনে হয় তারা হয় তো ওসবের ওপর দিয়েই যাচ্ছে তখন গা ঘিন ঘিন করে।

একুশ শতকের যুগে দেশের ট্রেনের টয়লেট ব্যবস্থা বড়ই বেমানান। ইলেকট্রিক ট্রেন, ম্যাগনেটিক ট্রেনের স্বপ্ন দেখার আগে চলতি ট্রেনের টয়লেট সারার স্বপ্ন দেখা উচিত।

সাধুর মোড়, রাজশাহী থেকে

চোরাচালানকারী

- মোহাম্মদ হান্নান

২০০০ সালের কথা। জয়পুরহাট থেকে ট্রেনযোগে সান্তাহার, তারপর বগুড়া আসবো। সঙ্গে আমার বন্ধু বাবুলও আছে।

সন্ধ্যা ছয়টায় টিকেট কেটে ট্রেনে উঠলাম। কোথাও সিট পাচ্ছিলাম না। সিটের সন্ধান শেষ করলাম।

একেবারে শেষ বগিতে কেউ নেই। শুধু কয়েকটা বস্তা পড়ে আছে। বগিটাও তেমন পরিচ্ছন্ন নয়। পানের পিক, সিগারেটের ফিল্টার, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কনডমের প্যাকেট পড়ে আছে যত্রতত্র।

শরীরে একটা ঝাকুনি দিল। কিন্তু বগুড়ায় আসতে হবেই। তাই জানালার পাশে বসে পড়লাম।

ট্রেন ছাড়ার সিগনাল পেতেই চারজন মহিলা এসে আমাদের পাশে বসলো।

আমি আর বন্ধু বাবুল মুখোমুখি বসেছি।

একজন পয়ত্রিশ বছরের মহিলা এসে আমার পাশে বসলো।

প্রশ্ন করলো, কোথায় যাবেন?

বললাম, বগুড়া।

সে আর কিছু বললো না।

একটু পরে মহিলাটি বললো, খুব গরম পড়েছে। বলেই কাধের ওপর থাকা শাড়ির আচল দিয়ে বাতাস পাবার চেষ্টা করলো।

আমি আর বাবুল খেয়াল করলাম শাড়ির আচল কাধ থেকে নামিয়ে নিতেই বেরিয়ে পড়লো বক্ষ যুগল। তারপর নাভি, পেট যা অন্য রকম এক আকর্ষণ সৃষ্টি করছিল।

আমরা দুজন বাইশ বছরের যুবক মহিলাটির টান টান বুকের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিছু পরে চোখ সরিয়ে নিলাম। খেয়াল করলাম বাবুল মহিলাটির নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করতে থাকা অসমান আকর্ষণীয় বুকটা দেখছেই।

বললাম, ট্রেন তো ছেড়ে দিল। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছাবো।

ট্রেন স্টেশন ছাড়লো। খোলা জানালা দিয়ে বাতাস আসতে থাকায় মহিলাটি তার শাড়ির আচলে হিমালয়সম বুক, নাভি ঢেকে ফেললো। ভাবলাম আকর্ষণীয় এই দৃশ্য আর দেখা যাবে না।

একটু পর ধারণা পাল্টে গেল। বাতাস তার বুকে থাকা শাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বার বার। সে সব আমি আর বাবুল দুজনই দেখছি এবং শুনছি চার মহিলার গল্প।

ট্রেন এগিয়ে চলছে। হঠাৎ ওপাশ থেকে এক মহিলা পানের পিক ফেলতে জানালায় মুখ রাখালো। শব্দ করে পিক ফেলতে গিয়ে বেশ কয়েক ফোটা পানের পিক এসে আমার হাতে পড়লো। কোনো কিছু বলার আগেই

মহিলাটি খপ করে আমার হাত ধরে শাড়ির আচল দিয়ে মুছে দিতে দিতে *ভুল হয়েছে* জাতীয় বুলি আওড়াতে লাগলো।

খেয়াল করছি তার জোড়া বক্ষ দুটি। ট্রেনের ঝিম ঝিম শব্দের সঙ্গে তার ঝাকুনিতে নেচে উঠছে শাদা বুক। আমার দিকে ঝুকে থাকায় ব্লাউজের ওপর দিয়ে ঠেলে বেড়িয়ে এসেছে মাংসপিণ্ড। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল একটু ছুয়ে দিতে।

মহিলাটি হাত পরিষ্কার করে দিয়ে তার আসনে গিয়ে বসে পড়লো।

বাবুল আমার চোখের দিকে তাকালো। কোনো কথা বললো না। হয়তো কামনার আগুন তার মধ্যে জ্বলে উঠছে। শুধু কি তার একার? মহিলাদের হাব-ভাব দেখে আমিও যে জ্বলছি।

আমার গা ঘেষে বসা মহিলাটি এতোক্ষণ যে দূরত্ব রেখেছিল তা এখন আর নেই। ট্রেনের ঝাকুনিতে গায়ে গা লেগে আছে। মহিলার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমিই দূরত্ব সৃষ্টি করলাম। নিজের মধ্যে ঘৃণার জন্ম নিল। নারী নামের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড থেকে আমার মোমের মতো শরীরটাকে সরিয়ে রাখলাম।

কিছুক্ষণ পর দুজন পুলিশ এসে হাজির। মোটা গোফওয়ালা পুলিশ কোনটা কার বস্তা, কোনটায় কি আছে এসব জিজ্ঞাসা করলো।

চার মহিলাই বললো, ইনডিয়ার মসল্লা আর চিনি ছাড়া কিছুই নেই।

জয়পুরহাট সীমান্ত এলাকা হওয়ায় চোরাই পথে ইনডিয়ায় বিভিন্ন পণ্য রেল-বাসযোগে মার্কেটে পৌছে যায়।

গলাটা উচু করে গোফওয়ালা পুলিশ বললো, চিনি প্রতি বস্তা দেরশ টাকা ও মসল্লা পঞ্চাশ টাকা করে দে।

কিন্তু চার মহিলার কেউ-ই রাজি হলো না।

দুই পুলিশকে তারা দুইশ করে চারশ টাকা দিতে রাজি হলো।

পুলিশ রাজি হলো না।

অনেক কাকুতি-মিনতি করে ছয়শ টাকায় শর্ত সাপেক্ষে দুই পুলিশ রাজি হলো।

শর্তটা ছিল চারজনকেই দুই পুলিশের সঙ্গে দৈহিক মিলন করতে হবে। না হলে জেলখানায়।

দেহের জন্য জেলখানায়, কিছুতেই মেনে নেবে না চার মহিলা। এমন একটি অঘোষিত বাক্য তাদের সুঠাম দেহে, চোখে, মুখে ফুটে উঠলো।

আমি আর বাবুল দুটি প্রাণী যে বসে আছি তাদের পাশে সেটা নজরে এলো না পুলিশের।

এবার শর্ত পালনের পালা। গোফওয়ালা পুলিশের সঙ্গে যে এসেছিল সে টয়লেট দেখে নিল। নাক সিটকানো দেখে বোঝা গেল কামনা-বাসনা পূরণের জায়গা সেটি নয়।

বাবুল আমার সামনে বসা, তার পেছনের দিকে পুলিশটি চলে গেল মহিলাদের ইশারা করে।

চার মহিলা ওঠার আগে নিজেরা কি যেন সব কথা বলে নিল। তারপর যার যার আসনে বসে পড়লো।

আমার গা ঘেষে যে মহিলাটি বসে ছিল সে বললো, আমার এখন ইচ্ছা করছে না। তুই যা।

আরেকজনকে দেখিয়ে দিতেই মহিলা চলে গেল।

গোফওয়ালা পুলিশ তখনো দাড়িয়েই আছে। বন্ধু বাবুলের পেছন থেকে পুলিশের বুট প্যান্ট আর বেল্টের ঝনঝনের শব্দ পাচ্ছি।

গোফওয়ালা পুলিশ আমার পাশের মহিলাটির দিকে এগিয়ে এসে বললো, তোর ইচ্ছা করছে না? আয়, আমার সঙ্গে আয়, তোর ইচ্ছা জাগাবো।

মহিলাটি না করলেও পুলিশ হ্যা করেই আমার সিটের পেছনের অন্ধকারের দিকে চলে গেল।

দুই বন্ধুর পেছনে আদিম নৃত্যের মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে। প্রাথমিক মঞ্চ থেকে বিভিন্ন মিউজিক ভেসে আসছে। এই পরিবেশে আমাদের ঠিক কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। উঠে গিয়ে অন্য কোথাও বসবো, সেটাও সম্ভব নয়। যেখানে বসে আছি সে জায়গাটা ছাড়া গোটা বগিই অন্ধকার।

আমার কান গরম হয়ে উঠছে। বাবুলকে খেয়াল করলাম, সে পরিশ্রান্ত হয়ে সিটের সঙ্গে যেন শুয়ে আছে। চোখ দুটো বড় বড়। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। নিজের মধ্যে এতোটাই ক্ষোভের জন্ম নিল যে, আমি মন্ত্রী এমপিদের কেউ হলে দুই পুলিশকে গুলি করে মারার নির্দেশ দিতাম।

এরপরের শব্দগুলো আরো বেশি অসহ্য। রাগে নিজের মাথার চুলগুলো ছেড়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

বাকি দুই মহিলার একজন আমার দিকে এগিয়ে এলো। বললো, খারাপ লাগছে? বেশি খারাপ লাগলে আমি তো আছিই।

শুধু বললাম, ওদিকে সরে বসেন।

মহিলা এগিয়ে এলো না। সেখানেই বসে থাকলো।

কিন্তু এগিয়ে আসতে থাকলো যৌন মিলনের মিউজিক। সিডি ছাড়াই সেসব ভয়ানজ শব্দ আমার কানে আসছে।

একটু পরেই গোফওয়ালার সঙ্গে যে মহিলা যৌন আনন্দে গিয়েছিল সেই মহিলাটি কাপড় পরতে পরতে আমাদের দিকে এলো আর উন্মুক্ত বুকে কালো রঙের ব্রা লাগাতে লাগাতে এসে বসে পড়লো।

একজন জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়ে গেল?

মহিলাটি বললো, বলিস না, কিছুক্ষণ স্তন জোড়া নাড়াচাড়া করলো। পেটিকোট খোলার পর দেখি পুলিশের সব ভেজা। সব ঘটনা ওখানেই শেষ। নামেই শুধু পুলিশ। আসল কামে না।

গোফওয়ালা পুলিশ আর আসেনি। তার সঙ্গের পুলিশটি এক মহিলার সঙ্গে দৈহিক মিলন করে যাবার সময় শুধু বলে গেল, তোদেরটা পাওনা থাকলো।

মহিলারা তাদের পরনের কাপড় ঠিকঠাক করে পরে নিল। কিন্তু চোখ আর সে সব দেখছিল না, দেখছিল অন্ধকার আকাশের বুকে জ্বলে থাকা তারা।

অপেক্ষায় আছি ট্রেন একটু থামলেই বগিটা বদলাবো। সময় এলো।

জামালপুর স্টেশনে ট্রেন থামতেই বন্ধু বাবুলের বাম হাতটা খপ করে ধরে পরের একটা বগিতে উঠলাম। সিট নেই, দাড়িয়ে আছি।

বাবুল প্রস্রাব করতে চলে গেল।

এরপর সান্তাহার থেকে ট্রাকযোগে বগুড়া পৌছেছিলাম।

বন্ধুদের ঘটনাটি বলেছিলাম। তারা স্থির করেছিল ট্রেন ভ্রমণ করবে।

পরে জানতে পেরেছিলাম জয়পুরহাট–সান্তাহার ট্রেনলাইনে মহিলারা চোরাচালানি ব্যবসা করতে গিয়ে পুলিশ–দালালদের নিয়মিত দেহ দান করে থাকে। জেলে না যেতে চাইলে দেহ দান করতেই হবে।

ঠনঠনিয়া, বগুড়া থেকে

ভালোবাসার টানে

- সালমা আহমেদ

আমার বিবাহিত জীবন আট বছরের। আমি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনার্সের ছাত্রী। পড়াশোনা অবস্থায় প্রেমের বিয়ে। তবে আজ আমরা প্রতিষ্ঠিত। শুধু প্রতিষ্ঠিত বললে ভুল হবে, বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত। কি যে সংগ্রাম করে এই অবস্থায় এসেছি তা লিখতে গেলে উপন্যাস হয়ে যাবে।

মূল গল্পে আসি। ছোটবেলায় ট্রেন ভ্রমণ অনেকবার করেছি। কিন্তু ভিন্ন একটা ট্রেন ভ্রমণের কথা আজ লিখবো।

১৯৯৯ সালের কথা। আমার স্বামী বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সের অফিসার। তখন তার পোস্টিং এয়ার ফোর্স ঘাটি জহুরুল হক চিটাগাং। এর আগে সে আমাকে নিয়ে একবার চিটাগাং গিয়েছিল। এই প্রথম চট্টগ্রাম যাওয়া এবং পাহাড় দেখা ও সমুদ্রের নোনা জল ছোয়া। অল্পদিন ছিলাম সেখানে। কি যে ভালো লাগার ঘোরের ভেতর দিয়ে সময় গিয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

ঢাকায় চলে আসার পর আমার খুবই মন খারাপ।

একদিন ফোন করে সে আমাকে বললো আবার তার কাছে যাওয়ার জন্য।

আনন্দে আমার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কিন্তু যাবো কিভাবে? থাকি শ্বশুরবাড়ি। আমার শ্বশুর অত্যন্ত ভালো মানুষ। আমাকে খুবই আদর করেন। কিন্তু বুঝতে দেন না।

তার মেজাজ খুবই কড়া। তার কাছে কিছুই বলা যাবে না। আমাদের প্রতিবেশী ছোট ভাই, নাম বাবু। তাকে বললাম আমাকে চিটাগাং নিয়ে যাওয়ার জন্য।

বলা মাত্রই সে রাজি হয়ে গেল। কারণ সে পড়াশোনার জন্য ইনডিয়া চলে যাবে। তার বড় বোন থাকে চিটাগাং, সেও যাবে দেখা করার জন্য।

তাকে দিয়ে টিকেট করালাম।

এবার ভয়ে ভয়ে আব্বাকে বললাম চিটাগাং যাওয়ার কথা।

তিনি শুনেই না করে দিলেন।

ভয়ে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার সাহস পেলাম না।

এদিকে শাশুড়িও আমার শ্বশুরকে ভয় পান।

আম্মাকে বললাম, এখন কি করবো?

আম্মা বললেন, যাবার দরকার নেই।

বললাম, টিকেট যে কাটা হয়ে গেছে।

যাহোক, চোখের পানি ফেলে অনেক কষ্টে বাবুকে নিয়ে বের হলাম কমলাপুর স্টেশনের দিকে। ট্রেন ছাড়বে সোয়া আটটায় আর পৌছালাম পৌনে আটটায়। কিন্তু যথাসময়ে ট্রেন ছাড়লো না। শুনতে পেলাম চিটাগাংয়ে কিসের যেন গণ্ডগোল হয়েছে। ট্রেন নাও যেতে পারে। শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া অবস্থা। এতো কষ্টে এখানে এসেছি আবার ফিরে যাবো, এই চিন্তায় আমার বুকটা কষ্টে ভরে উঠলো।

অবশেষে ট্রেন যখন স্টেশন ছাড়লো তখন হাপ ছেড়ে বাচলাম। আমার শুধুই মনে হচ্ছিল, ট্রেন কেন দ্রুত যাচ্ছে না, তার কাছে কখন পৌছাবো ইত্যাদি।

নানান চিন্তার মাঝে ট্রেন যখন ফেনী পার হয়ে চিটাগাংয়ের পথে পাহাড় দেখা যাচ্ছে তখন হঠাৎ করে এক অজানা জায়গায় থেমে গেল।

ভাবলাম কেউ হয়তো বা চেইন টেনে নেমে গেছে। কিন্তু প্রায় আধা ঘণ্টা পর জানতে পারলাম সামনের স্টেশনে রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে। কারণ একজন চেয়ারম্যান গত রাতে খুন হয়েছেন। তাই বিক্ষুব্ধ জনতা রেললাইন ও সড়কপথ সব বন্ধ করে দিয়েছে।

এখন কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। ট্রেনে ঘোষণা দিয়েছে, ট্রেন ঢাকায় ফেরত যাবে। যারা যেতে চায় তারা যেতে পারেন।

অনেকে ফেরত যাচ্ছেন আবার অনেকে নেমে যাচ্ছেন।

বাবু বললো, ভাবী কি করবো।

বললাম, ফেরত যাবো না, যতো কষ্টই হোক যাবোই।

দুজনে দুটো ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম।

এতো সাহস সেদিন কোথেকে এসেছিল আজ ভাবলেও শিউরে উঠি।

তারপর পায়ে হেটে অনেক দূর আসার পর একটা ভ্যানগাড়ি পেলাম।

সে যাবে না।

অনেক কষ্টে বেশি টাকার বিনিময়ে রাজি হলো বহদ্দারহাট পর্যন্ত যাবে। তারপর আর যাবে না।

অনেকের সঙ্গে উঠে পড়লাম। কিন্তু বহদ্দারহাট পৌছাতেই বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম।

সেখান থেকে যাওয়ার আর কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই কিছুদূর আবার পায়ে হেটে গেলাম। সেখান থেকে এক ট্রাকে করে পৌছালাম বিএমএ পর্যন্ত। ওখান থেকে একটা বেবিট্যাকসি নিয়ে বাবুর বোনের বাসা হালিশহর যখন পৌছালাম তখন রাত সাড়ে আটটা।

বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, শরীরের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। ফোস্কা পড়ে আর ফুলে পায়ের অবস্থা জঘন্য।

বাসায় পৌছেই ফোন করে জানলাম, সে রুমে নেই, আজ সে ডিউটি অফিসার।

এক সার্জেন্ট বললো, স্যার রাউন্ডে গেছেন, আর সারা রাত ডিউটি করবেন।

সে আমাকে নিতে এলো পরদিন সকালে। সেদিন ছিল শুক্রবার। ওর সঙ্গে যখন হানিমুনে লজে পৌছালাম তখন দুপুর বারোটা।

ভালোবাসার টানে সেই দুঃসহ ট্রেন ভ্রমণের স্মৃতি আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কুর্মিটোলা, ঢাকা থেকে

সে

- অর্পিতা

এই পর্যন্ত বহুবার ট্রেনে চড়েছি। ট্রেনের জানালা দিয়ে উপভোগ করেছি রাত ও দিনের গ্রাম বাংলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য। বিন্দু বিন্দু আলোর মাঝে রাতের সৌন্দর্য দেখে নিজের অজান্তেই মনে হয়েছিল ইশ, এমন সময় আমার পাশে যদি কেউ থাকতো!

তবে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির শাটল ট্রেনে চড়ে। শাটল ট্রেন এবং নৌকা চলার মধ্যে খুব বেশি ডিফারেন্স নেই।

একদিন চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম *মহানগর প্রভাতী*-তে। ঠেলাঠেলি করে ট্রেনে উঠে সিট নাম্বার খুজে পেয়ে যখন বসলাম তখন আপু জানালেন, ভিড়ের মধ্যে আপুর ব্যাগ থেকে কেউ টাকা নিয়ে গিয়েছে।

আমার পেছনের সিটে বসেছিল একজন সুদর্শন যুবক। সে বেশ আগ্রহ নিয়েই জানতে চাইলো, কেমন করে হলো?

আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গে তার বেশ ফৃ সম্পর্ক হয়ে গেল। জানলাম সে ব্যবসা করে। তার নিজস্ব একটি অ্যাড ফার্ম আছে।

কিছুক্ষণ পর সে আমাকে বলে বসলো, আমি চাইলে তার অ্যাড ফার্মে আমাকে মডেলিংয়ে চান্স দেবে।

এক বাক্যেই তাকে না করে দিলাম।

সে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়লো।

এরপর সে আমার ফোন নাম্বার চাইলো।

ফোন নাম্বার জানাতেও অপারগতা প্রকাশ করলাম।

তবে তার পীড়াপিড়িতে উপায়ান্তর না দেখে মেইল অ্যাডড্রেস দিয়েছিলাম।

প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে সেদিন চলে এসেছিলাম।

কিছুদিন পরই সে আমাকে মেইল করলো যার সারমর্ম ছিল, *আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার কথা আমার খুব মনে পড়ে* ইত্যাদি।

আমি হতবাক! তিন ঘণ্টায় একটা মানুষকে ভালোবাসা যায়? ভালোবাসা কি এতোই সহজ? ভালোবাসা তো কোনো পণ্য নয়। তিন ঘণ্টায় হয়তো একটা মানুষকে ভালো লাগতে পারে। কিন্তু ভালোবাসা? তার কাছে মনে হয় ভালোবাসার সংজ্ঞাটাই এমন। সে আমাকে বার বার বোঝাতে চেয়েছিল তার সহজ ভালোবাসার কথা।

কিন্তু তার সহজ ভালোবাসা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। তাই তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখিনি।

কুমিল্লা থেকে
nahid20003@yahoo.com

কমন জেন্ডার

– এ রহমান

আমরা তিন বন্ধুর মধ্যে খোকন একটু ব্যতিক্রম। পড়ালেখার পর্ব শেষ হবার আগেই ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা দেখছে। তাছাড়া সোনিয়া নামের একটি সুন্দরী মেয়েকে প্রেম করে বছর খানেক হলো বিয়ে করেছে।

এদিকে আমি আর শিবলী *বাদ্দাইম্মা* (আঞ্চলিক ভাষা)।

খোকন একদিন ফোন করে বললো, তুই যে IELTS দিতে পাসপোর্ট করিয়েছিলি, পাসপোর্টটা ঠিক মতো আছে তো?

ঠিকই আছে। হঠাৎ পাসপোর্টের প্রসঙ্গ উঠলো কেন? দুবাই পাঠাবি নাকি?

সে ক্ষমতাও আছে, পাঠালেও পাঠাতে পারি। জানিস না, শিবলীর বাবা দুবাই থাকে। শোন, শুক্রবারে পাসপোর্টটা নিয়ে চট্টগ্রামে চলে আয়, বিস্তারিত এলেই শুনবি, কোনো প্রশ্ন নয়। শুক্রবারে ঈদ করতে গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা যাবো। আজ রাতের *তূর্ণা নিশীথায়* উঠবি, চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লায় চলে আসবো, ট্রেনের টিকেট পেলে চলে আয় ভালোই হবে। আমি, শিবলী তোর জন্য স্টেশনে থাকবো। নিশীথা তো ভোরে পৌছাবে। তাই টিকেট পেলে রিং দিস, ঠিক আছে?

সকাল সাতটায় চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌছাতেই ওরা আমাকে নিয়ে চলে গেল ইনডিয়ান এমবাসিতে।

তোরা এখানে নিয়ে এলি কেন?

ভিসার জন্য দাড়াবো, সোনিয়াও আসবে।

আমরা ইনডিয়া সফরে যাচ্ছি।

কবে যাচ্ছি?

আজ ভিসা হয়ে গেলে ঈদের পরের সপ্তাহে।

কোথায় কোথায় যাচ্ছি?

কলকাতা, আজমীর, দিল্লি, আগ্রা, সিমলা।

কতোদিনের মামলা?

বিশ পচিশ দিনের। তবে ভিসা নেবো এক মাসের।

খোকনকে দুষ্টামি করে দুলাভাই সম্বোধন করি। তবে দুলাভাই, তোমার এতো সময় কোথায়!

আমার সময় আছে বলেই তোদেরকে বলছি, না বলিস না, প্লিজ।

ঈদের পর পর আমার হাতে টাকা হবে না যে দুলাভাই।

শালা, এতো কথা শুনতে চাই না, তুই শুধু একশ ডলার নিবি, বাকি আমরা দেখবো।

আমার কাছে এক ডলারও নেই।

তুই তোর ইউসুফমামাকে বললেই তো তিনি ইটালি থেকে একশ ডলার পাঠিয়ে দেবেন। আপাতত রুমি, তোর ভালোবাসা, তার থেকে ধার নে, রুমির কাছে তো প্রায় সময়ই বেশ টাকা থাকে, প্রয়োজনে আমরা সুপারিশ করবো।

সকল প্রস্তুতি নিয়ে ১ ফেব্রুয়ারি চলে গেলাম বাই রোডে কলকাতায়। চারজনে মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, প্রথমে আমরা আজমীর খাজা বাবার দরবার জিয়ারত করবো, তারপর অন্যান্য মিশন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতার হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে জয়পুর স্টেশন, তারপর বাসে আজমীর। হাওড়া টু জয়পুর মামলা পচিশ ছাব্বিশ ঘণ্টা। বাবা! এতো বড় ট্রেন জার্নি এটাই আমার জীবনে প্রথম।

অনেক কিছুরই অভিজ্ঞতা হয়েছে এই দীর্ঘ পচিশ ছাব্বিশ ঘণ্টা লং জার্নিতে। ছোটখাটো বিচিত্র ঘটনাও ঘটেছে। বিশেষ করে কমন জেন্ডারের ঘটনা মনে পড়লে নিজেই হেসে উঠি।

ইনডিয়ার ট্রেনগুলো বাংলাদেশের মতো না। এদের ট্রেনগুলো বিশাল এবং সিটগুলো ভিন্নধর্মী। যেমন তিনজন করে মুখোমুখি ছয়জন বসার এবং শোয়ার এক, দুই তিন তলা সিট।

ইনডিয়ানদের কাছে আমরা বিদেশি। আমাদের সঙ্গে আরো দুজন বিদেশি আছে। একজন জাপানিজ, অন্যজন কোরিয়ান। ওরাও টুরিস্ট। আমাদের সমবসয়ী হবে।

রাত পেরিয়ে ভোর হলো। এমন সময় এক স্টেশন থেকে হকারের সঙ্গে বেশ কয়েকজন হিজড়া উঠলো। হিন্দিতে কিসব বলে টাকা চাচ্ছে। ঠিক মনে পড়ছে না।

বাথরুম সেরে এসে শুয়ে আছি। ঘুম ঘুম চোখ। শিবলি, আমি পাশাপাশি দোতলায়। কোরিয়ান, জাপানিজ তিন তলায়। সোনিয়া, খোকন নিচে।

হিজড়াদের দেখে খোকন, সোনিয়া বাথরুমের কথা বলে কেটে পড়লো।

তিনজনের একটি হিজড়া বাহিনী আমাদের কাছে এসে ওই একই কথা। একজন আদরের সঙ্গে শিবলির গাল টানছে।

এই পরিস্থিতি দেখে ঘুমের কঠিন ভান ধরলাম। তাতেও রক্ষা নেই। অন্য একজন হিজড়া আমার চাদরের নিচে হাত ঢুকিয়ে ট্রাউজারের উপর দিয়ে আমার অঙ্গ ধরে *লু লু লু* করতে লাগলো।

তখন আমি লজ্জায় লাল। এতো শীতের মাঝেও শরীর ঘাম দিল। কি করবো বুঝতেও পারছি না। ভাগ্যিস সোনিয়া নেই। এ দৃশ্য সোনিয়া দেখলে? মাই গড!

আরেকজন সোনিয়া, খোকনকে বলছে, হ্যালো মানি, হ্যালো।

ওরা তাকিয়েই রইলো।

শিবলি বিশ টাকা দিয়ে ওদের বিদেয় করলো। যাবার সময় মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

হিজড়া বিদায়ের পর খোকন, সোনিয়া হাসতে হাসতে এসে বলে, এদের দেখে কেটে পড়লাম।

বললাম, দুলাভাই, তুই একটা রাজাকার।

নিষেধ করা সত্ত্বেও হিজড়াদের ঘটনা শিবলি, খোকন, সোনিয়াদের বিস্তারিত বলার সময় কোরিয়ান জানতে চাচ্ছে Who are they? Why they want money – *ওরা কারা? ওরা কেন টাকা চাইছে।*

তখন শিবলি বললো, ওরা হিজড়া।

হিজড়া।

আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড।

তারপর সোনিয়া সহজভাবে বোঝানোর জন্য বললো, মিস্টার জিম, ওরা কমন জেন্ডার।

তখন সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলাম। কি জানি কোরিয়ানটা বুঝতে পেরেছিল কি না?

শাহাজাহানপুর, ঢাকা থেকে

নীল নয়না

- আরিফ আহমেদ

জুন মাসের মাঝামাঝি সময়। সবে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। হাতে বেশ কিছুদিন সময়। ছোট চাচা-চাচির অনুরোধে আর ফুপুকে অনেক দিন দেখি না এই অজুহাতে ফুপুবাড়ি বেড়ানোর মনস্থির করলাম। ফুপা নেভিতে চাকরি করেন। থাকেন চট্টগ্রামের পতেঙ্গার নেভি কলোনিতে।

ট্রেনে যাবো, ট্রেনের টিকেট আগেই কাটা ছিল। বয়সটাই জানি কেমন! ট্রেনে উঠলেই মন বলে, ইশ যদি কোনো সুন্দরী মেয়ের পাশে সিট পড়তো!

তিনটা সিট একই টিকেটে থাকলেও একটি সিটের নাম্বার ছিল অনেক পেছনে। চাচা-চাচিকে পাশাপাশি সিটে বসতে দিয়ে চলে গেলাম পেছনের সিটে।

বসতে গিয়ে আমার চোখ আটকে গেল। দুটো চোখ আমার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। চোখের মণি দুটি গাঢ় নীল। আমাদের চোখে যেমন শাদা অংশের মাঝে কালো অংশ, সেই মেয়ের কোনো কালো অংশ ছিল না। পুরোটাই নীল। এতো সুন্দর নীল চোখ এই প্রথম দেখলাম।

পাশের সিটের মোটা মহিলার হাত ঘুমের মধ্যেই আমার শরীরে এসে পড়লো।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে চোখ সরিয়ে নিলাম।

ওই নীল নয়নাও চোখ সরিয়ে নিল। সে আর আমার দিকে তাকালো না।

কিন্তু আমি কি আর ঠিক থাকতে পারি! বার বার চোখ ছুটে যায় ওই চোখের দিকে।

সাধারণত ট্রেনে যাওয়ার সময় বাইরের দৃশ্য দেখেই সময় কাটিয়ে দিই। কিন্তু ওই দিন কি যে হলো! আমি আমাকে বোঝাই, ওই চোখের দিকে তাকাসনে, ফাদে পড়িসনে। তুই ভালো ছেলে, তোর চোখ ভালো, তুই ভালো হয়ে থাক।

আমি বুঝি ঠিকই কিন্তু এ মন যে বোঝে না! ওই চোখে তাকানোর আকাঙ্ক্ষার রক্ত।

মেয়েটির চেহারা দেখার উপায় ছিল না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোলাপি রঙের বোরখায় ঢাকা। কিন্তু ওই চোখ। ওই চোখ দেখে মনে হলো মেয়েটি তার পাশে বসে থাকা মায়ের মতোই অসাধারণ সুন্দরী। ওই চাখ যে এতো গভীর, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ভৈরব থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ছয় সাত ঘণ্টার পথ শ্বাসরুদ্ধকরভাবে কাটলো। চট্টগ্রামের দুটি স্টেশন। একটি পুরনো, অন্যটি নতুন। পুরনো স্টেশন পেরিয়ে নতুন স্টেশনে ঢুকতে হয়।

এক ফাকে বাথরুমে গিয়েছিলাম। এসে দেখি ওরা নেই। শূন্যতা অনুভব করলাম।

পরক্ষণেই দেখলাম যে সিটে আমার নীল নয়না বসেছিল সেই সিটেই একটি ডায়রি পড়ে আছে। এক ঝটকায় ডায়রিটা হাতে তুলে নিলাম। ডায়রিতে তেমন কিছুই ছিল না। তবে আমার সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটাই ছিল। ঠিকানা।

ফুপুবাড়ি পৌছে আমার ফুপাতো বোন, ক্লাস নাইনে পড়ুয়া লিমাকে সব খুলে বললাম।

সে আমার ভালো বন্ধু এবং আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলো।

নীল নয়নার বাসা ছিল দক্ষিণ হালিশহরে। লিমাদের নেভি কলোনি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আর কাকতালীয়ভাবে ওই বাসা লিমার বান্ধবী কান্তাদের বাসা। পরে জানতে পারলাম আমার নীল নয়না কান্তারই বড় বোন। নাম শান্তা।

আমাদের ড্রয়িংরুমে বসতে দেয়া হলো।

তিনি আসলেন, সেই নীল চোখ। কিন্তু তখন তো পুরো মুখ শাদা স্কার্ফ জাতীয় কিছু একটা দিয়ে ঢাকা।

ডায়রি দিলাম।

তিনি ধন্যবাদ দিয়ে নাশতা আনতে ভেতরে গেলেন।

অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে ওনার ছোট বোনকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা কান্তা, তোমার বোন সব সময় অমন ঘোমটা দিয়ে রাখে কেন?

অমনি কান্তার মুখ মলিন হয়ে গেল।

তার কাছ থেকে জানলাম, ছয় সাত মাস আগে কোনো এক বখাটে আমার নীল নয়নার মুখ এসিড দিয়ে ঝলসে দিয়েছে। সে এখন এই দগ্ধ মুখের জ্বালা নিয়ে সবার কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখে।

ওই রাতে আমার ঘুম হয়নি। আমার ঘুম এখনো হয় না। ওই নীল চোখ আমার ঘুম হতে দেয় না। ওই চোখের ঝলকানি সারাক্ষণ আমার মনে খোচা দেয়। আমি আমাকে বোঝাই। আমি বুঝি। কিন্তু এ মন বোঝে না। তাকে এখনো ভালোবাসি। অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসি।

নটর ডেম কলেজ, ঢাকা থেকে

অনুভূতি

- খ ম ওয়াজ

২০ মার্চ। আমি *লালমণি এক্সপ্রেস* ট্রেনযোগে ঢাকা আসছিলাম। নয় থেকে দশ ঘণ্টা যাত্রাপথ। যেন বোর ফিল না করি সে জন্য সঙ্গী হিসেবে নিয়েছিলাম যাযাদি এবং সেদিনের দৈনিক।

বড় ছেলে অগ্রিম টিকেট কেটে রেখেছিল। যথাসময়ে নির্দিষ্ট চেয়ারে আসন গ্রহণ করলাম। কিছুক্ষণ পর আমার সমবয়সী এক ভদ্রলোক এসে সামনের সিটে বসলেন।

ট্রেনটি যখন যাত্রা শুরু করলো তখন আমরা ছিলাম চারের মধ্যে দুই অর্থাৎ বাকি দুটো সিট ছিল যাত্রীশূন্য।

ভদ্রলোক দৈনিক পত্রিকাটা চেয়ে পড়া শুরু করলেন।

জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলে প্রকৃতির রূপ দেখতে লাগলাম। চৈত্র মাস। রুক্ষ প্রকৃতি। তবে গতকাল যে কিছু বৃষ্টি হয়েছে তা বোরো ক্ষেত, গাছপালার পাতা ও মাটি দেখলে বোঝা যায়। ভাবছিলাম এই বোরো ধান বাজারে উঠলে চালের দাম কমবে কি না।

ভাবনায় ছেদ পড়লো সহযাত্রীর প্রশ্নে। তিনি জানতে চাইলেন আমার গন্তব্যস্থল।

জানালাম।

তিনি যাবেন ঢাকার এয়ারপোর্ট স্টেশন। জানালেন, ঢাকায় তার দুই ছেলে থাকে। বড় ছেলে ইনডিয়ায় ইংরেজিতে মাস্টার্স করে ঢাকায় চাকরি করছে আর পুত্রবধূও চাকুরে ও মাস্টার্স। ওদের দুই সন্তান। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ভদ্রলোকের ছোটটি ঢাকায় অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়ছে। ওদের দেখার জন্যেই ভদ্রলোকের ঢাকা আগমন।

তিনি বিরতি ও দ্বিধাহীন চিত্তে তার পারিবারিক, বৈষয়কি নানান কথা বলে যাচ্ছিলেন। আমি বিরক্তি বোধ করছি কি না সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না তার। নাটোর পর্যন্ত তারই কথা শুনতে হয়েছে আমাকে।

নাটোরে এসে বাকি দুই সিট এক দম্পতির অধিকারে চলে গেল।

বাচাল লোকটি এবার তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় শুরু করলেন।

ওই ফাকে যাযাদির লেখাগুলোর বুকে সাতার কাটা শুরু করলাম। অভ্যাসবশত প্রথমে *প্রেস নোটস* ও *উদ্ধৃতি*–গুলো পড়ে শেষ করি।

বাচাল ভদ্রলোকটি যাযাদিটি চেয়ে বসলেন।

দিলাম হাত বাড়িয়ে।

নামটা পড়ে বললেন, যায়যায়দিন, কি বিদঘুটে নামের বাবা! কিসের ম্যাগাজিন এটি ভাই সাহেব?

আমার প্রিয় পত্রিকা সম্পর্কে তার তাচ্ছিল্য রূপ দেখে মেজাজটা আমার তিরিক্ষি হয়ে গেল। গম্ভীর গলায় বললাম, এটা ম্যাগাজিন নয়, সাপ্তাহিক পত্রিকা।

তিনি যাযাদিটা ফেরত দিতে দিতে বললেন, আগে চোখে পড়েনি। ছেলেমেয়েদেরও পড়তে দেখিনি। পত্রপত্রিকার তো অভাব নেই দেশে। অভাব আছে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের। তাই পত্রপত্রিকার ওপর আস্থা নেই।

তার কথাটা ফেলনা নয়। তবু মেজাজটা আরো খারাপ হলো।

নাটোর থেকে ওঠা ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা আমার মুখের দিকে তাকালেন কি বলি তা শোনার জন্য হয় তো।

বললাম, এ পত্রিকার বয়স একুশ বছর। চেহারায় এর জৌলুস নেই। দেখতে অতি সাধারণ হলেও অসাধারণ ব্যক্তিরা এটা পড়েন এবং এতে লেখেন। এদের ভাড়াটে লেখক নেই, এরা দলবাজি করে না।

আমার কথা শুনে লোকটার ফেসের ওয়েদার রিপোর্টে ভাটা দেখা দিল। আর কোনো বাক্য ব্যয় করলেন না।

এয়ারপোর্ট স্টেশনে নামার আগ মুহূর্তে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। বললাম, আমি যাযাদির একজন নিয়মিত পাঠক এবং এটি আমার প্রিয় পত্রিকা।

লোকটি আমার দৃষ্টি থেকে অপসৃত হলো। মনে ভেসে উঠলো মফিজের ছবি। গত ৮ মার্চ তাকে দেখেছিলাম মতিঝিল পাড়ায় যাযাদির *ফাল্গুনী ভালোবাসার* বিশেষ সংখ্যা বিক্রি করতে। হেকে যাচ্ছিল, *যায়যায়দিন পড়ুন, সব মানুষকে ভালোবাসুন, হিংসা হানাহানি ভুলে যান*।

সে সকালে পত্রিকা বিক্রি করে, দুপুরে ঝুড়ি করে ফল বিক্রি করে।

ছেলেটি ক্লাস নাইন পাস। বুঝুক আর না বুঝুক নিয়মিত যাযাদি পড়ে বলে জানালো সে। বললো, জানার কি শেষ আছে স্যার।

ওর কথা ভেবে বিষণ্ন হওয়া মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো। জানার প্রতি ছেলেটির আগ্রহ আমাকে অবাক করেছিল। আমরা কতোজন তা অনুভব করি?

তালতলা, খিলগাও থেকে

সমস্যা

তখন ক্লাস টেনে পড়ি। ঈদের ছুটতে বাড়ি যাচ্ছি ট্রেনে। ময়মনসিংহ থেকে জামালপুর। শীতের সকাল, লোকাল ট্রেন। আমার সঙ্গে ছোট ভাই ও মা। লম্বা বেঞ্চের মতো সিট। জানালা দিয়ে শীতের কুয়াশার বিদায় নেয়া দেখছি। মনে মনে ভাবছি সুন্দর একটি মেয়ে সামনে থাকলে সময়টা ভালো কাটতো।

আমার বামপাশে ছোট ভাই, তারপর মা। আমার ডানপাশে মাঝ বয়সী এক লোক। গায়ে চাদর মোড়ানো, প্যান্ট–শার্ট পরা। লাজুক ছিলাম খুব।

সেই ভদ্রলোক প্রথমে যেচে পরিচিত হতে চাইছেন। তার নাম মাসুদ আলী আর আমার নাম মাসুম। হয়তো আমাকে ইমপ্রেস করার জন্য তিনি আমার নামের কাছাকাছি একটা নাম বলেছিলেন। তার বাড়ি দেওয়ানগঞ্জে, পেশায় ব্যবসায়ী।

কিছু আলাপের পর তার মাফলারের একটা অংশ আমার প্যান্টের জিপার বরাবর আড়াআড়িভাবে রাখলো। তারপর তার বাম হাতটা চলে গেল আমার জিপারের ওপর। আস্তে আস্তে আমার পুরুষাঙ্গে চাপ দিচ্ছেন।

বিব্রত বোধ করছি। কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না।

তিনি আমার কানের কাছে এসে বললেন, একটু রস বের হলেই দেখাবে ভালো লাগবে।

তিনি আমার জিপার খুলতে উদ্যত হলে সিট থেকে উঠে দাড়ালাম। মনে হচ্ছিল তার গালে চটাং করে একটা চড় বসিয়ে দিই। কিন্তু সে সাহস তখন ছিল না। প্রায় একটা ঘণ্টা দাড়িয়ে ছিলাম, তবুও ওই বজ্জাত লোকটার পাশে আর বসিনি।

এখনো মাঝে মধ্যে সেই বিকৃত রুচির মানুষটার কথা মনে হয়। নিজে নিজেই তখন বিব্রত হই, আর ভাবি, কতো কিসিমের মানুষ আছে এই দুনিয়াতে!

এটা ছিল এক ধরনের সমস্যা। ট্রেন ভ্রমণে আরেক ধরনের সমস্যায় পড়েছিলাম বছর তিনেক আগে।

তখন ২০০২ সাল। কেয়ারটেকারের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের মিথ্যা অপবাদের কাছে আমি পরাজিত। নিজের মা-বাবার কাছ থেকে এমন অপবাদের ভার আর জ্বালা সহ্য হচ্ছিল না। নিক্ষিপ্ত হলাম সন্দেহের কারাগারে। মনটা খুব বিষিয়ে উঠলো। সেই বছর এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম। পরীক্ষার কয়েক মাস আগেই সিদ্ধান্ত নিলাম, নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করবো। পরীক্ষা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বই খাতা নিয়ে বের হয়ে কোচিংয়ে না গিয়ে চলে যেতাম সিনেমা হলে।

বাংলা, ইংরেজি পরীক্ষা কোনোমতে দিলাম।

একদিন গ্যাপের পর পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষা। এবার পালাতে হবে। সব কিছুই প্ল্যান মতো হচ্ছে। সেদিন ছিল ২২ মে। সাজেশনের কথা বলে বাসা থেকে বের হয়েছি। সম্বল পকেটের সাতশ টাকা।

রাত আটটায় চলে গেলাম ময়মনসিংহ স্টেশনে, গন্তব্য অনিশ্চিত। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে চোখ গেল ভাসমান পতিতাদের ওপর। বিশ টাকায় একজনকে ঠিক করার পরও ভয়ে সেদিন কিছুই করা সম্ভব হয়নি। আমার কৌমার্য অক্ষত রয়ে গেল।

রাত নয়টায় মাইকে ঘোষণা দিল *মহুয়া এক্সপ্রেস* ট্রেনটি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে।

ট্রেনে উঠে বসলাম। সেটা ছিল লোকাল ট্রেন। দুজন ছেলের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাদের বয়স আনুমানিক বারো তেরো বছর হবে। তারাও ঢাকা যাবে। সাতপাচ না ভেবে সময় ক্ষেপণের জন্য তাদের সঙ্গে গল্প শুরু করে দিলাম। ততোক্ষণে ট্রেন চলতে শুরু করেছে। রাতের আকাশ দেখছি, নক্ষত্রের আলো আর জোনাকিদের সঙ্গে কথা বলছি। টিকেট না করেই ট্রেনে উঠেছি। রাতের বেলাতে এই লাইনের লোকাল গাড়িগুলোতে টিটি থাকে না। জিআরপি (জেনারেল রেলওয়ে পুলিশ)-র লোকজনই তেমন হর্তাকর্তা। সেই ছেলে দুটো আমার সঙ্গে তখন আছে।

একজন জিআরপি আমার কাছে টিকেট দেখতে চাইলো আর ছেলে দুটো আমার সঙ্গের লোক কি না জানতে চাইলো।

কিছু না বুঝেই হঠাৎ বলে দিলাম, এরা আমার সঙ্গে যাচ্ছে।

যেহেতু টিকেট দেখাতে পারিনি, তাই তারা টাকার জন্য দাড়িয়ে রইলো। তিনজনের জন্য একশ টাকা চাইলো।

ওই ছেলে দুটো ভাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানাই।

তাদের বোঝাতে চাইলাম, তারা আমার সঙ্গে যাচ্ছে ঠিকই, ময়মনসিংহ স্টেশনে তাদের সঙ্গে পরিচয়। এর বেশি তাদের চিনি না।

জিআরপি আমাকে শিশু পাচারকারী দলের সদস্য বলে সন্দেহ প্রকাশ করলো।

আশপাশের সবাই তাদের কথার সঙ্গে একমত পোষণ করলো।

একজন যাত্রী বলে উঠলো, কবে থেকে এই ব্যবসা শুরু করেছিস।

আরেকজন বললো, সাইজ করে থানায় দিয়ে দেন।

আমার আত্মারাম ততোক্ষণে খাচা ছেড়ে পালিয়েছে। এমনিতেই ভীতু, তার উপর এমন পরিস্থিতিতে আমার অবস্থা বেসামাল। শিরদাড়া বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। একবার মনে হলো, চলন্ত ট্রেন থেকে

লাফিয়ে পড়ি। ততোক্ষণে কয়েকটা মসজিদ, মন্দিরে মানত করে ফেলেছি। আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর, গড সবাইকেই ডাকছি।

শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ। ছেলে দুটোর কাছে হরেক রকম প্রশ্ন ছোড়া হচ্ছে। তারা উত্তর দিতে বেশ থতমত খাচ্ছে।

একজন জিআরপি কানের কাছে ফিশফিশ করে বলছে, কিছু মাল ছাইড়া কাইট্যা পড়।

সবার অগোচরেই একটা হাত বাড়িয়ে দিল। প্যান্টের চোরা পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক বান্ডল দুই টাকার নোট দিলাম। পর পর দুবার টাকা দিলাম। *এনশেইন্ট মেরিনার*–এর মতো আমিও যেন রিলিজ পেলাম।

নতুন স্টেশনে গাড়ি থামতেই অন্য বগিতে চলে গেলাম। তারপর আকাশের তারা গুণতে গুণতে ফজরের আযানের একটু পরে ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে এসে পৌছালাম।

কমলাপুর স্টেশনে বাস্তুহারা মানুষদের ঘুমানোর দৃশ্য টিভিতে দেখেছি। তবে বাস্তবে এই প্রথম। মোজাইক করা বেঞ্চগুলোর একটিতে গা এলিয়ে দিলাম। একটু পর পুলিশের ডাকে তন্দ্রা কেটে গেল। স্বচোখে দেখলাম, লাঠির গুতোয় কিভাবে হতদরিদ্র এই মানুষদের ঘুম ভাঙে। তন্দুর রুটি দিয়ে সকালের নাশতা করলাম। সারা দিন স্টেশনে থেকে রাতে একটা লোকাল ট্রেনে চট্টগ্রাম চলে গেলাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ময়মনসিংহ থেকে

ভিক্ষুক

- এম হাসান পারভেজ

২০০৩ সালের যেকোনো একদিন চট্টগ্রাম থেকে ফেনী আসছি। প্রতিদিনের মতো বিভিন্ন পেশাজীবী ভিক্ষুক ট্রেনে উঠে ভিক্ষা চাচ্ছে। ভিক্ষুকদের মাঝে যারা বৃদ্ধ তাদেরকে দেখলে আমার আব্বা–আম্মার কথা মনে পড়ে তাই বৃদ্ধদের বেশি ভিক্ষা দিই।

অনেক ভিক্ষুকের মাঝে হঠাৎ আমার মতো বাইশ তেইশ বছর বয়সী একটা ছেলে আমার পাশে এসে ভিক্ষা চাচ্ছে। *চিকিৎসার জন্য কিছু সাহায্য করেন*।

দেখলাম ছেলেটি ক্রাচে ভর দিয়ে হাটছে। তাকে দেখে তার মাঝে নিজেকে কল্পনা করি এবং শিহরিত হলাম। তারপর তাকে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় দিয়ে তার কষ্ট উপলব্ধি করছি। ঠিক তখনি ট্রেন চালু হয়ে গেছে। ছেলেটি তাড়াতাড়ি নেমে গেছে।

হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে দেখি ছেলেটি ক্রাচটা কাধে নিয়ে সুস্থ মানুষের মতো প্ল্যাটফর্মে হাটছে। আমার দিকে তাকিয়ে বাকা হাসি হেসে চলে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছি। মনে মনে সেই প্রতারকের প্রতি খুব ঘৃণা জন্মালো এবং গালিও দিলাম। ইচ্ছা হলো ট্রেন থেকে নেমে কিছু উত্তম–মধ্যম দিই। কিন্তু ততোক্ষণে ট্রেন...।

ঠিকানা বিহীন

অবলা

- কানিজ ফাতেমা

দিন কয়েক আগের কথা। আমি আর মা মামাবাড়ি থেকে ময়মনসিংহ ফিরছিলাম। বরাবর বাসেই যাই। এবার শখ করে ট্রেনে উঠেছি। ট্রেন ছেড়ে দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে হুড়মুড় করে এক মহিলা উঠলেন। কোলে একটি দুধের বাচ্চা। মহিলাটি এসে বসলেন ঠিক আমার পায়ের কাছে। বাচ্চাটি চিৎকার করে কাদছে তো কাদছেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, এমন কাদছে কেন?

মহিলাটি বললো, বোধহয় ক্ষিধে লেগেছে।

মা বললো, খাওয়াচ্ছ না কেন?

বললো, এতোটুকুন দুধের মাইয়া, মায়ের দুধ ছাড়া কি খায়?

বললাম, তাই দাও না কেন?

জবাব দিল, কেমনে দিমু? এর মায়েরে আমি পামু কই?

খুব অবাক হলাম।

তুমি ওর মা না? জিজ্ঞাসা করলাম।

না, আমি মোড়ল ব্যাটার কামের বেটি। হেয় মোড়লের নাতনি।

আরো অবাক হলাম। ভ্রূ কুচকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি একে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

মহিলাটি চুপ করে রইলো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি।

সে নীরব, শান্ত। অথচ কিছুক্ষণ আগেও হাপাচ্ছিল। বাচ্চাটি তখনো কাদছে।

হাত বাড়িয়ে কোলে নিলাম। আশ্চর্য! কান্না থেমে গেল।

মহিলাটি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

আবারও জিজ্ঞাসা করলাম।

সে এবার উদাস স্বরে জবাব দিল, *পলাইতেছি*।

আমি আর মা বিস্ময়ে হতবাক! এরপর সে নিজ থেকেই সব বললো। কিছু আর জিজ্ঞাসা করতে হয়নি।

নাম-ঠিকানা কিছু বলেনি। শুধু বলেছে নিষ্ঠুর কাহিনীটা।

সে কাজ করতো এক মোড়লের বাড়িতে সেই ছোটবেলা থেকেই। মোড়লের ছিল এক ছেলে। বড় উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের ছিল সে। মেয়েদের পটানো ছিল তার নেশা। তার নেশার শিকার হয়েছিল কাজের মেয়ে সফিনাও। তবুও দুটো ভাতের অভাবে মুখ বুজে ছিল সে।

একদিন লম্পটটা কোথা থেকে যেন এক ডানাকাটা পরী ধরে আনলো। বাবা-মায়ের আদরের দুলালি। বজ্জাতটার মিথ্যা কথায় অকপটে সরল বিশ্বাসে মায়ের সব গয়না আর বাবার টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছিল সে। মোড়ল পরিবারে কয়েকদিন তার সে কি আদর! মোড়ল নিজে ওদের বিয়ে দিলেন। হিংসা হচ্ছিল সফিনার।

রাজকন্যা এক সময় অন্তঃসত্ত্বা।

মোড়ল বললেন, এবার তোমার বাবার কাছে যাও। নিশ্চয় ফেলবেন না। আর ফেরার সময় কিছু টাকা নিয়ে এসো। না, আমার জন্য নয়, তোমার সন্তানের জন্য।

এই পোড়ামুখ নিয়ে বাবার কাছে যেতে রাজি হলো না সে। শুরু হলো মানসিক নির্যাতন। ধীরে ধীরে সমস্ত গৃহকাজের ভার পড়লো গৃহবধূর ওপর। এক সময় শুরু হলো দৈনিক নির্যাতন। এখন হিংসার বদলে মায়া হতে লাগলো সফিনার। কেমন যেন একটা টান অনুভব করতো। আস্তে আস্তে স্বামী হয় বহির্মুখী। এরই মধ্যে জন্ম হয় এক কন্যা সন্তানের।

মাস খানেক যেতেই স্বামী তাকে নোংরা প্রস্তাব দেয়। তার কেবল টাকা চাই। এ জন্য বৌ বিক্রি করতে কোনা দ্বিধা নেই।

কিন্তু ভদ্র পরিবারের মেয়ে সে। ভালোবাসার টানে ঘর ছেড়েছে। সে কি করে পারে নিজের দেহকে খদ্দেরের হাতে তুলে দিতে। সে প্রত্যাখান করে এই প্রস্তাব। রাজি হয় বাপের কাছে যেতে। যায়ও সে। গিয়ে দেখে বাবা মারা গেছেন। একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিয়ে গেছেন একটা এতিমখানায়।

শূন্য হাতে ফিরে আসে সে।

এবার অত্যাচারের মাত্রা যায় বেড়ে। স্বামীর বক্তব্য, তোর রূপ দিয়ে পূজা করার জন্য তোকে বিয়ে করিনি। আমার কাছে শাদা চামড়া, কালা চামড়া সবই সমান। তোরে নিয়া আমার আলাদা কোনো মজা নেই। তারচেয়ে বরং তোর রূপ দেইখ্যা যাগো চোখ ঝলসায় তাগো খুশি কর। তুইও সুখী হবি, আমিও টাকা পামু।

গৃহবধূ দিন–রাত স্রষ্টার কাছে কেদে মুক্তি চায়।

এক রাতে তার মাতাল স্বামী এক হাতে মদের বোতল, অন্য হাতে খদ্দের ধরে নিয়ে আসে। শোবার ঘরে তাকে বসায়। বৌকে সেখানে পাঠিয়ে খিল এটে দেয়।

বৌ আগন্তুকের মাথায় ফুলদানি দিয়ে বাড়ি দিয়ে চিৎকার করে বাইরে বেরিয়ে আসে।

ধরা পড়ে স্বামী–শ্বশুরের হাতে।

খদ্দেরও আহত হয়ে পালায়।

সেদিন চরম মাত্রায় রেগে যায় স্বামী। প্রহারে প্রহারে ক্ষত বিক্ষত করে বৌকে। এক সময় গায়ে পেট্রল ঢেলে ছুড়ে মারে জলন্ত সিগারেট। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন।

উঠানে তড়পাতে থাকে সে। তার আকুল মিনতি, আমাকে পুড়িয়ে মেরো না, আমার বাচ্চা দুধ ছাড়া কিছু খায় না।

সে প্রচণ্ড ভালোবাসতো স্বামী, সন্তানকে। তার ভালোবাসার মর্যাদা কেউ দিল না।

সে রাতেই বাচ্চাটিকে নিয়ে পালিয়েছিল সফিনা। এখানে–সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বললাম, চলো আমাদের সঙ্গে।

কিন্তু সে রাজি হলো না। বললো, *আফনেরা শিক্ষিত মানুষ। থানা পুলিশ করবেন। ওরা টাকার জোরে বাইচ্যা যাইবো গা। মাঝখান থেইক্যা আমি ঝামেলায় পড়ুম।* আর *বাচ্চাটারও দুর্গতি হইবো। তারচেয়ে যদি পারি ওকে বাচাই।*

আমি ওকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম। বললাম, এখন নারী নির্যাতনের কতো শাস্তি।

কিন্তু সে কিছুই শুনলো না।

এক স্টেশনে বাচ্চাকে নিয়ে নেমে কোথায় চলে গেল কে জানে।

ময়মনসিংহ থেকে

টিপস

– ঝিলন

যখন আপনি ট্রেন যাত্রী হবেন তখনকার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় টিপস।

এক. প্রথমে ট্রেনের টিকেট কেটে বসুন। প্রয়োজনে টিটিকে টিকেট দেখিয়ে আপনার সিটে বসুন।

দুই. সারা দেশে এখনো বোমা আতংক চলছে। কেউ যাত্রীবেশে, আপনার সিটের পাশে কালো পলিথিন প্যাকেট নিয়ে বসলে সন্দেহ হলে টিটিকে বলুন।

তিন. আপনার পাশের যাত্রীর সঙ্গে হালকা কুশল বিনিময় করতে পারেন। কিন্তু তার দেয়া খাবার খাবেন না।

চার. আপনার পাশে জানালা লক করে রাখুন। ট্রেন চলার সময় দুষ্ট ছেলেরা ইট, পাথর ছুড়ে মারে।

পাচ. ফার্স্ট এইড বক্স সঙ্গে রাখুন। স্যালাইন, মাথা ব্যথার ওষুধ রাখতে পারেন।

ছয়. টয়লেট পেপার, টিস্যু, পলিথিন অবশ্যই রাখুন। কারণ ট্রেনের টয়লেটের পানি ব্যবহার করতে খুবই অসুবিধা হয়।

সাত. স্টেশনের কাছে এলে আপনার প্রয়োজনীয় খাবার খেতে পারেন। ট্রেন চলাকালীন পানি জাতীয় খাবার খেতে খুবই অসুবিধা হয়। মালামাল নিজ দায়িত্বে রাখুন।

নয়. পাশের যাত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। কারণ আপনার বিপদে সেই এগিয়ে আসবে।

দশ. ট্রেনে না ঘুমিয়ে বই, ম্যাগাজিন পড়ুন কিংবা আপনার নিজস্ব ওয়াকম্যানের গান শুনুন।

ভোলা থেকে

পাপী

- গালিব

চলন্ত ট্রেনের দুলনিতে ঝিমুনি আসছে। গত তিন দিন খুব খাটুনি গেছে। সকাল আটার মধ্যে বের হয়ে সারা দিন মাঠে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করার পর রাতে রিপোর্ট তৈরি করা। শরীর যতোটুকু ঘুম চেয়েছে তা পায়নি। এখন ফল পাচ্ছি। যাত্রায় ঘুম আমার অপছন্দের। এখন সে ঘুমকেই আরামদায়ক মনে হচ্ছে।

আমার সামনে বসে আছে লায়লা, হাপাচ্ছে। আকাশী শাড়িতে ওকে মানিয়েছে।

লায়লার পাশে বসা লোকটি ওর দিকে পানির বোতল এগিয়ে দিল।

ঠোট একটু ফাক করে এক ঢোক পানি খেয়ে বোতল ফেরত দিল। কিন্তু লায়লা আমার সামনে বসে আছে কেমন করে? ওর তো শ্বশুরবাড়িতে থাকার কথা।

হঠাৎ করেই নিজেকে চলন্ত ট্রেনের বগিতে আবিষ্কার করলাম। নিশ্চয়ই আমার ঘুমের মধ্যে ও কোনো স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছে। পাশের লোকটি মনে হচ্ছে ওর স্বামী। স্বামীর চেহারার দিকে তাকাতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। চারকোণা পাথরে ভোতা অস্ত্র দিয়ে চেছে চেছে মানুষের রূপ দিলে যেমন হয়, অনেকটা সে রকম। এই লোকের স্ত্রী কি না পৃথিবীর সেরা সুন্দরী লায়লা!

লায়লা মনে হয় এখনো আমাকে দেখেনি।

কি মনে করে ওকে ডাক দিলাম।

ও আমার দিকে তাকালো। ওর চোখের তারায় খুশির ঝিলিক দেখলাম ওই একবারই। পরমুহূর্তেই ওর চোখের ভাষা পাল্টে গেল।

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গলায় বললো, আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

সাংঘাতিক একটা ধাক্কা লাগলো বুকে। লায়লা সত্যিই আমাকে চিনতে পারছে না। প্রথম প্রেম কি কেউ কখনো ভুলতে পারে? মরিয়া হয়ে বললাম, লায়লা, আমি জাফর, তোমাদের সঙ্গে এক পাড়ায় থাকতাম।

কিন্তু লায়লা আমাকে চেনার কোনো চেষ্টা না করে খুব নির্লিপ্ত গলায় বললো, দুঃখিত, আপনি ভুল করছেন, আমি আপনাকে চিনি না।

উত্তেজনাবশত দাড়িয়ে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লাগছিল। এই লায়লা যে আমার সেই লায়লা তা বুঝতে আমার বাকি ছিল না।

আমার আসনে বসলাম। মাত্র দুই বছর লায়লার সঙ্গে আমার দেখা নেই। এর মধ্যে লায়লার কাছে অপরিচিত হয়ে গেলাম। অথচ এই মেয়েকে হারিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনে কোনোদিন বিয়ে করবো না। নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গাধা বলে মনে হচ্ছিল। কষ্টের পরিবর্তে এক ধরনের প্রতিশোধ স্পৃহা নিজের মধ্যে টের পেলাম।

লায়লা যদি আমাকে ভুলে বিয়ে করে সুখী হতে পারে তবে আমি কেন পারবো না? আমি ওর চেয়ে বেশি সুখী হবো।

ইতিমধ্যে ট্রেন আমার নির্দিষ্ট গন্তব্যে এসে দাড়ালো।

বাংকার থেকে আমার ব্যাগটি নিয়ে লায়লার দিকে একবারও না তাকিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলাম।

লায়লাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেলাম বা ভুলে যাওয়ার ভান করলাম।

বাড়ি থেকে এতোদিন বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল। আর উচ্চবাচ্য না করে রাজি হয়ে গেলাম।

মিতু আমার জীবনে এলো। ওকে নিয়ে বেশ সুখেই দিন কাটতে লাগলো। মাঝে মধ্যে লায়লার স্মৃতি যে মনে আসেনি তা নয়। তবে লায়লার সঙ্গে শেষ দেখার কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর প্রতি তীব্র ঘৃণা বোধ করতাম।

এই ঘটনার পচিশ বছর পর ট্রেনে করে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। শ্বশুর সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মিতু ও ছেলেমেয়েকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। সেই দিনকার পত্রিকায় চোখ বোলাচ্ছিলাম।

পাশ থেকে এক মহিলা আমার নাম ধরে ডাকলো।

পত্রিকা থেকে চোখ তুলে তাকাতেই বুকে ড্রাম বেজে উঠলো। এ যে লায়লা!

ঘিয়ে রঙের একটি শাড়ি পরা। গায়ের রঙের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। তবে চেহারায় মলিনতার ছাপ স্পষ্ট।

আমার ক্ষোভটা জেগে উঠলো। বললাম, আমি জাফর না।

ওর ঠোটের কোণে একটু হাসি খেলে গেল। বললো, পচিশ বছরের রাগ এখনো যায়নি।

আবারও বললাম, আমি জাফর নই।

লায়লা এবার অনুনয় করে উঠলো, জাফর প্লিজ, আমার কথা একটিবার শোনো।

খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, বলো।

লায়লা একটুক্ষণ চুপ থাকার পর বলতে আরম্ভ করলো। বিয়ের ঠিক পর পরই ওর এক নিকট আত্মীয় আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা ওর স্বামীর কাছে বলে যার প্রেক্ষিতে ওর স্বামী ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু লায়লা সব অস্বীকার করে।

এরপরে ট্রেনের বগিতে আমার সঙ্গে ওর দেখা। কিন্তু লায়লা আমাকে না চেনার ভান করলেও ওর স্বামী ঠিকই আমার পরিচয় বুঝতে পেরেছিল। এর ফলাফল হয়েছিল ভয়াবহ। কথায় কথায় লায়লার স্বামী ওকে আমার কথা বলে অত্যাচার করতো।

এক পর্যায়ে লায়লা ওর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে ওর স্বামীর সংসার ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে আসে। সেখানেই বসবাস করতে থাকে। মাঝে মধ্যে ওর স্বামী আসতো। কিন্তু গত পনেরো বছরে একবারও সে আসেনি, লায়লাও কোনো যোগাযোগ করেনি।

লায়লার কথা শুনে কি বলবো বা কি বলা উচিত বুঝতে পারছিলাম না।

লায়লা হঠাৎ উঠে দাড়ালো। ওর গন্তব্যস্থল এসে গেছে, নামবে।

কিছুই বলতে পারলাম না।

শুধু চেয়ে চেয়ে ওকে প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে হারিয়ে যেতে দেখলাম।

ফরিদপুর থেকে

অবশেষে...

- ইমরান রহমান

গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল যাচ্ছি ছোট মামার সঙ্গে। মামা বয়সে আমার থেকে দুই তিন বছরের বড় হবে। প্রথমবারের মতো ট্রেনে চড়ছি। তাই কৌতূহল বেশি।

যাই হোক। অনেক ঝামেলার পর ট্রেন ছাড়লো। আমাদের সামানের সিটে মুরব্বি টাইপের দুজন লোক বসা। মামা জানালার পাশে বসেছেন আর আমি যে পাশে বসেছি সেই পাশের সিটে একটা মেয়ে বসা।

মেয়েটি যথেষ্ট সুন্দরী। মেয়েটার পাশে মোটা এক মহিলা বসা, সম্ভবত মেয়েটির মা। মহিলাটি বেশি কথা বলে। একটু পর পর খাচ্ছে আর মেয়েকে দিচ্ছে খাওয়ার জন্য। কিন্তু মেয়েটা খাচ্ছে না।

মামার দিকে তাকিয়ে দেখি মামা মেয়েটাকে দেখছেন। মামা আমাকে বললেন, তুই আমার সিটে আয়।

সিট পাল্টালাম।

মামা মেয়েটাকে অপলক চোখে দেখছেন।

মেয়েটা বিরক্ত হয়ে বললো, এই যে আপনি কি আমাকে দেখছেন!

মামা বললেন, কই, না তো! আপনাকে দেখবো কেন? দেখার তো অনেক কিছুই আছে।

মেয়েটা বললো, তাহলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

মামার সঙ্গে মেয়েটার ছোটখাটো ঝগড়া হলো।

মামা গম্ভীর হয়ে আছেন।

মেয়েটা যেখানে বসে ছিল তার সামনের সিট একেবারে খালি ছিল।

সিট পাল্টে ওই সিটে গিয়ে বসলাম। মেয়ে পটানোর জন্য বন্ধু মহলে আমার বেশ নাম ডাক আছে।

মেয়েটাকে বললাম, আপু, আপনি কিসে পড়েন?

মেয়েটা বললো, আমি আইডিয়ালে পড়ি।

এখান থেকে শুরু। আমরা কথা বলছি। পরিচয়ের পর্ব শেষ।

মেয়েটা মামাকে দেখিয়ে বললেন, উনি তোমার কি হয়?

বললাম, আমার মামা।

মামা গম্ভীর হয়ে বসে আছেন।

মেয়েটি মামাকে বললো, আমি সরি। ওই ব্যাপারটার জন্য আমি খুবই লজ্জিত। আসলে আমি খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম। কিছু মনে করবেন না, প্লিজ।

মামা বললেন, না, ঠিক আছে। কিছু মনে করিনি। পাশের মহিলা আপনার কি হয়?

মেয়েটা বললো, আমার মা।

সবার সঙ্গে সবাই সহজ হয়ে গেল। মেয়েটার সঙ্গে মামা গল্প করছিলেন আর আমি মহিলাটির সঙ্গে।

কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। মামা তখন ঢাকা কলেজে পড়েন।

আপুদের নামার সময় হয়ে এসেছে। আমরা যেখানে নামবো তার এক স্টেশন আগে আপুরা নামবেন।

আপুটা আমাকে বাসার ঠিকানা দিয়ে বললেন, সময় পেলে বেড়াতে যেও।

মামাকে দেখিয়ে বললাম, ওনাকে দেবেন না।

সে বেশ জোরেই বললো, যার দরকার হবে সে চেয়ে নেবে।

ওনারা নেমে যাচ্ছেন। মামা নিচে নেমে ওনাদের বিদায় দিয়ে এলেন। ট্রেনে উঠে বললেন, ভাগ্নে, সেলফোন নাম্বার নিয়ে এলাম।

এর প্রায় দুই বছর পরের ঘটনা। আমার তখন এসএসসি পরীক্ষা। ২০০৪ সাল। মামা হঠাৎ আমাদের বাসায় এসে আম্মুকে বললেন, আপা, বিয়ে করবো।

আম্মু বললেন, বিয়ে করবি, তা পাত্রী ঠিক করেছিস? তাছাড়া তুই তো এখনো লেখাপড়া করছিস। বেকার, বিয়ে করে বৌকে খাওয়াবি কি?

মামা বললেন, পাত্রী আমিই দেখেছি। আমি এখন একটা পার্টটাইম জব করছি। তুমি সবাইকে রাজি করাও।

মামাকে আব্বু-আম্মু অনেক বোঝালেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না।

শেষ পর্যন্ত আব্বু-আম্মু নানা-নানুকে রাজি করাতে পারলেন। তবে বড় মামা একেবারে বেকে বসলেন।

যাহোক, অনেক বাধা-বিপত্তির পর সবাই রাজি হলেন।

আমি বাদে সবাই মেয়ে দেখে বিয়ের তারিখ ঠিক করে এসেছেন। আমার পড়াশোনার অনেক চাপ ছিল ওই সময়।

বিয়ের দিন মামার সঙ্গে আছি। মামা আমাকে বললেন, যা তোর মামিকে দেখে আয়। পছন্দ হয় নাকি দেখ।

হেসে বললাম, বিয়ে তোমার। আমার পছন্দের কোনো কিছু তো এখানে নেই। এই বলে মামির স্টেজের দিকে গেলাম। কিন্তু কনেপক্ষরা আমাকে ঢুকতে দিল না।

মামা এবার তার এক বন্ধুকে দিয়ে আমাকে ভেতরে পাঠালেন।

মামির পাশে বসে আছি।

মামি বললেন, চিনতে পেরেছো।

আমাকে অবাক হয়ে থাকতে দেখে বললেন, মনে করার চেষ্টা করো। দুই বছর আগে ট্রেনে যাওয়ার সময়...।

অবাক হয়ে বললাম, আপনি?

মামি আমাকে মাঝের দুই বছরের ঘটনা বললেন কিভাবে মামার সঙ্গে এতোদূর...।

মামিকে বললাম, বিয়ে তাহলে হলো অবশেষে।

মামির চোখে মুখে জয়ের আনন্দ।

গাজীপুর থেকে

ভীতিময়

– মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া

সম্ভবত ১৯৮৬ সালের শেষদিকের কথা। শাহীন, সাঈদ ও আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম চট্টগ্রামে। থাকার ব্যবস্থা শাহীনের ভাবির বাড়িতে।

বেড়ানো শেষে ঢাকায় ফেরার জন্য চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌছে দেখি যেন চারদিকে মানুষের সমুদ্র। জানতে পারলাম আজ হরতাল। বাস যোগাযোগ বন্ধ বলে ট্রেনে গন্তব্যে ফেরার চাপ বেশি।

তখন সকালে ঢাকা–চট্টগ্রামে *উল্কা এক্সপ্রেস* নামে ট্রেন ছিল। এই অবস্থা দেখে শাহীন প্রস্তাব করলো সেদিন না যাবার জন্য।

আমরা দুজন ফিরতে রাজি নই। কারণ বিদায় নিয়ে চলে এসেছি আবার অতিথি হয়ে উঠতে লজ্জা লাগবে।

শেষ পর্যন্ত শাহীন একা চলে গেল। পরে ঢাকায় ফিরবে বলে।

ব্যাগ হাতে একের পর এক সব বগি দেখছি। কিন্তু কোনো বগিতে যে ওঠার সুযোগ পাবো সে আশা দেখছি না।

হরতালের কারণে ট্রেন প্রায় ঘণ্টার উপরে দেরি করে হুইসল দিয়ে চলার ইঙ্গিত দিল।

এবার তো আমাদের অবস্থা সঙ্গীন। শেষ পর্যন্ত সাঈদ জোর করে আমাকে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে এক বগিতে উঠে পড়লো। সহজে কি কেউ জায়গা দিতে চায়! তাই প্রথমে মৌখিক আপত্তি ও মৃদু ঝগড়া।

উঠে পড়ে কোনো রকমে দাড়াতে পারলাম মাত্র। কিন্তু হাতের ব্যাগ যে রাখবো সে জায়গা নেই কোথাও। উপরের বাংকারে মানুষ। পাচজনের সিটে ছয় সাতজন। দুই সিটের ফাকা জায়গায় মানুষ, করিডোরে মানুষ। এমনকি টয়লেটের ভেতরে পর্যন্ত মানুষ। এক কথায় সহজেই নরক দর্শন।

ট্রেন চলার সঙ্গে একটু বাতাস আসে। কিন্তু আমরা তা পাচ্ছি না। শীতের সকালেও ভ্যাপসা গরমে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মানুষের ভিড়ে দিনের বেলায়ও বগিতে কেমন অন্ধকার হয়ে আছে। সাইদকে বললাম, দোস্ত, এ জীবনে এটাই শেষ ট্রেন ভ্রমণ, না হয় লোকাল ট্রেনে শেষ ভ্রমণ।

পায়ের কাছে এক মহিলা বসেছে তার দুই বাচ্চাকে নিয়ে। বাতাস নেই, সেই সঙ্গে অন্ধকার দেখে বড় বাচ্চাটা একটু পর পর কাদছে।

ট্রেন একের পর এক বিভিন্ন স্টেশনে থামছে। যাত্রী নামা তো দূরের কথা, মনে হচ্ছে যাত্রী আরো উঠছে।

ভিড়ের মধ্যে অন্যান্য যাত্রীরা আলাপ করছে। এই ভিড়ের সুযোগে পকেটমারের দল হয় পকেট কাটবে, না হয় ব্যাগ কেটে মালামাল নিয়ে যাবে। মনে মনে একটু ভয় পেলাম। পকেট বাচাবো, না ব্যাগ বাচাবো!

শংকা নিয়ে ট্রেন ভ্রমণ করছি এবং ভাবছি কখন এই দম বন্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসার পর আমার সামনের সিটটা খালি হতেই চোখের পলকে দখল করলাম। মানবতা দেখাতে দুই বাচ্চাসহ তাদের মাকে সিটে বসতে দিলাম। বসার সুযোগ পেয়েই বাচ্চাটা আমার কোলে বসে গলা জড়িয়ে ধরেছে। কি সমস্যায় পড়লাম। যতোই তাকে বোঝাই সে গলা ছাড়ে না।

বাচ্চার মাও দেখি কেমন নির্বিকার। জানতে পারলাম তিনি টঙ্গী যাবেন। এর মধ্যে বাচ্চাটা পানি খাওয়ার আবদার করলো।

তখন আমাদের দেশে পানির বোতল সঙ্গে নিয়ে চলার কালচার বোধহয় চালু হয়নি। এদিকে হঠাৎ করে শেষ বিকেলে বৃষ্টি নেমে এসেছে। বৃষ্টির কল্যাণে যেন গুমোট ভাবটা কেটে একটু ঠাণ্ডা পরশ পেলাম। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে এলো।

পুরো বগিতে কোনো বাতি নেই। ঘুটঘুটে আধার। ট্রেন যখন কোনো এলাকার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, হয় বাড়িঘর, না হয় দোকানের আলো থেকে এক ঝলক আলো বগিতে পড়ছে।

ভৈরব স্টেশনে আসার পর বাচ্চাটাকে পানি খাওয়ানোর জন্য ট্রেন থেকে নামলাম। পানির কল পেয়েছি। কিন্তু পানি আনবো কি দিয়ে!

বাচ্চার মাকে বলতেই তিনি ব্যাগ থেকে টিফিন বাটি বের করে দিলেন।

পানি এনে দিতেই মাসহ বাচ্চারা যেভাবে তৃপ্তি নিয়ে পান করলো মনে হলো, তারা কতো দিন পানি না খেয়ে আছে।

অবশেষে ট্রেন যখন রাত নয়টার দিকে টঙ্গীতে থামলো তখন বাচ্চার মায়ের মুখে কথা ফুটলো। আমাকে ভাই ডেকে, ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিল।

রাত দশটার পর ট্রেন যখন কমলাপুর স্টেশনে পৌছালো। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে হাত পা নাড়াচাড়া করে মনে হলো নতুন জীবন ফিরে পেলাম।

বাসায় এসে এসব কথা বলতে সবাই দুঃখ প্রকাশ করলো এবং হরতালের মুণ্ডুপাত করলো।

উল্কা এক্সপ্রেস ট্রেনটির সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। ট্রেন ভ্রমণের কথা মনে পড়লে সেই অস্বস্তিকর, ভীতিময় ট্রেন ভ্রমণের কথা দুঃস্বপ্নের মতো মনে পড়ে।

দক্ষিণ গোড়ান, ঢাকা থেকে